ছেলেমানুষী

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩
© লেখক
প্রকাশকঃ শরীফ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ শরাফত খান
কম্পোজঃ
বিশ্বাস কম্পিউটারস্
৩৮/২খ বাংলাবাজার, ঢাকা
মুদ্রণঃ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামা প্রসাদ রায় চৌধুরী লেন
লক্ষীবাজার

মূল্যঃ ৪০ টাকা

উৎসর্গ

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের সহপাঠী খোকন
বগুড়া জিলা স্কুলের খেলার সাথী মাসুদ
আজন্ম কিশোর দুই শহীদ মুক্তিযোদ্ধা।

ভূমিকা

এই বইয়ের প্রথম তিনটি গল্প এক যুগেরও বেশী আগে লেখা। গল্পগুলি উদ্ধার করে দেবার জন্যে আমি অনুজ আহসান হাবীব ও অনুজ প্রতীম অপু'র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এখানে বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ছেলেমানুষী গল্পটি আমার জীবনের প্রথম লেখা। এই গল্পটি যে পরিমাণ বিতর্কের সূচনা করেছিল আমার অন্য কোন লেখা তা করেনি। গল্পটি আমার খুব প্রিয় গল্প, এই বইয়ে সংযোজিত করতে পেরে খুব ভাল লাগছে।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
৪ঠা জানুয়ারী ১৯৯৩

সূচীপত্র

- ছেলেমানুষী
- ব্যাধি
- অন্ধকারে একা
- সোনারিলের শিশি
- খুনী
- জঞ্জাল
- শোভন

এই বইয়ের সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক

ছেলেমানুষী

বেশ কয়দিন থেকেই আমাকে বলে দেয়া হচ্ছিল আমি যেন অফিস থেকে বাসায় ফেরার সময় একটা মানুষের বাচ্চা কিনে আনি। এসব কাজ আমার ঠিক পছন্দ নয়। আমাকে করতেও হয় না বিশেষ। কিন্তু গতবার অর্ডার মাফিক কোম্পানি থেকে যে বাচ্চাটা দিয়ে গিয়েছিল বাইরে থেকে তাকে বেশ ফুটফুটে লাগলেও মাংসটা খাওয়া যায় নি। ভেতরে মাঝে মাঝেই জটিল ধরনের ক্ষয়রোগ ছিল। শখ করে মাসে দু-একবার আমরা মানুষের মাংস খাই তার মাঝেও এ রকম ঝামেলার সৃষ্টি হলে মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যায়। অবশ্যি আমি নিজে তেমন ভোজন বিলাসী নই। খাবার-দাবারে আমার তেমন আগ্রহ নেই। তবু মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মতো করে মানুষের মাংস খাওয়াটা অভ্যেস হয়ে গেছে। এতে আমার নিজের না যতটুকু আগ্রহ আমার স্ত্রীর আগ্রহ তার থেকে অনেক বেশি। আমার স্ত্রী নিজেকে মনে হয় একটু বেশি জাহির করতে চায়—এতে আমি বিশেষ কোন দোষ দেখি না।

মানুষের বাচ্চা সাপ্লাই দেয়ার বেশ কয়টি দোকান আছে, একসময় আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের মানুষের মাংস খাওয়া একটা বড় ধরনের বিলাসিতা ছিল, ইদানিং এসব ব্যবসা সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিয়েছে। এখন বেশ অল্প দামে মানুষের বাচ্চা পাওয়া যায়। অবশ্যি কয়দিন পাওয়া যাবে বলা যাচ্ছে না, সামনের নির্বাচনে বিরোধী দলটি এই মানুষের বাচ্চার ব্যবসাকে হয়তো নির্বাচনী ইস্যু করে ফেলবে। আমার কাছে এসব ছেলেমানুষী মনে হয়। বেশ্যাবৃত্তি উঠিয়ে দিলেই কি পৃথিবী থেকে ব্যভিচার উঠে যাবে? মানুষের বাচ্চার ব্যবসা নিষিদ্ধ করে দিলেও মানুষ খাওয়া ঠিকই চলবে। এসব সহজ অভ্যাসের ব্যাপার। আর সরকারের আর্থিক দিকটাও তো দেখতে হবে—আমাদের কলোনি দেশগুলোর এসব মানবশিশুকে এভাবে কাজে না লাগালে এরা এমনিতেই অসুখে-বিসুখে যুদ্ধে মারা পড়তো।

সেদিন কোন এক পত্রিকাতে একজন ভদ্রমহিলা চিঠি লিখেছিলেন মানুষের বাচ্চা বিকিকিনির নিয়ম উঠিয়ে দেয়া উচিত। (আমি দিব্যি করে বলতে পারি তিনি এক বেলাও মানুষের মাংস না খেয়ে থাকতে পারেন না।) তার মতে, মানুষ হয়ে মানুষের মাংস খাওয়া নাকি মানব সভ্যতার পরিপন্থী। এভাবে চিন্তা করলে তো আমার হাঁস, মুরগি, মাছ সবই খাওয়া ছেড়ে দিতে হয়। আমরাও জীব; হাঁস, মুরগি মাছও জীব। কাজেই আমাদের হাঁস, মুরগি, মাছ খাওয়া উচিত নয়—এসব তো আর কাজের যুক্তি নয়। তিনি গোড়াতেই ভুল করেছেন—যাদের তিনি মানুষ বলে দাবি করছেন জীববিদ্যার সংজ্ঞা হিসেবেই শুধু তারা মানুষ, অন্য কোনদিক দিয়ে তাদের সাথে হাঁস, মুরগি বা মাছের কোন পার্থক্য নেই। আমার বন্ধু রফিক খুব ভালোভাবে এটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, সে এসব নিয়ে খুব পড়াশুনা করে।

যাই হোক, অফিস থেকে ফেরার সময় আমি আমার পরিচিত একটা দোকানে উপস্থিত হলাম। দোকানের ম্যানেজার আমাকে দেখে হাসিমুখে বের হয়ে এলেন। বললেন, গত পরশু আফ্রিকা থেকে একটা চালান এসেছে, এখনও তাদের দোকানে এসে পৌঁছো নি। আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলে সেখান থেকে বেছে একটা বাচ্চা কিনতে পারি। আমার অপেক্ষা করার সময় ছিল না, আর আফ্রিকান শিশু আমার ঠিক পছন্দ নয়, মাংসটা কেমন একটু শক্ত ধরনের হয়।

আমি ম্যানেজারকে নিয়ে তাদের স্টোরে গেলাম। ছোট ছোট খোপে দুটি-তিনটি করে উলঙ্গ শিশু বসে আছে। কখনো তাদের আমি কথা বলতে দেখিনি, অবশ্যি তারা কথা বলতে জানেও না। যে পরিবেশে মানুষ কথা বলতে শেখে, তাদের কখনো সে রকম পরিবেশে থাকতে হয় না। সাধারণত মায়ের দুধ ছাড়ার পরেই কোম্পানি ওদের কিনে নেয়, শরীরে ফ্যাট বাড়ানোর উপযোগী খাবার দিয়ে এদের তিন চার বছর পর্যন্ত বড়ো করে তোলা হয়। তারপর চালান দিয়ে আমাদের দেশে আনা হয়।

আমি গতবারে দেখে যাওয়া হাতকাটা একটি মেয়েকে এবারেও দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা ম্যানেজার সাহেব, এখানকার সব ছেলেমেয়েই কি বিক্রি হয়?

তা হয়ে যায়, ম্যানেজার একটু গর্বিতভাবে বললেন, আমাদের জিনিস খারাপ হয় না।

বিক্রি না হলে শেষে কি করেন?

বিক্রির অযোগ্য হলে মেরে ফেলতে হয়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন—পেপারে উঠেছিল খবরটা, গতবার ইন্দোনেশিয়ার পুরো একটি চালানের ছেলেমেয়েগুলোকে মেরে ফেলতে হয়েছিল। ডাক্তারী পরীক্ষায় কি একটি ভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল। ওহ! আমাদের অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল।

আমি একটা বাচ্চা ছেলেকে লক্ষ করছিলাম, কেন জানি তাকে আমার চেনা চেনা লাগছিলো। আমি মনে মনে একটু চিন্তা করে দেখলাম ওকে আগে কোনোদিন দেখেছি কিনা। মনে পড়লো না, মনে পড়ার কথাও নয়। কারণ ওকে আগে দেখার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। ছেলেটা আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছিল না, আড়চোখে দেখছিল আর চোখ পড়তেই দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ করে আমার মনে পড়ে গেল ছেলেটা আমার পরিচিত নয়, ওর এই বিশেষ ভঙ্গিটা আমার খুব পরিচিত। আমার সবচেয়ে ছোট ছেলেটা কোনো অন্যায় করে ফেললে বকুনি খাবার আগে এভাবে মিটমিট করে আড়চোখে তাকায়। আমার ভারী আশ্চর্য লাগলো, খাওয়ার জন্যে যে ছেলেটা কিনতে এসেছি তার সাথে নিজের ছেলেকে তুলনা করছি!

আমার মনে হঠাৎ একটি অদ্ভুত ভাবনা উঁকি দিয়ে গেল, আমার ছোট ছেলেটি, যার ডাক নাম বাবুল, তাকে যদি কোথাও এমনি করে বিক্রি করা হতো? বিশ্রী ভাবনাটা সরিয়ে আমি ছেলে বাছতে মনোযোগী হলাম।

মধ্যপ্রাচ্যের একটি ছেলেকে বেশ পছন্দ হল। ছোটখাট গড়নের—কিন্তু মাংসল দেহ, গালগুলো ফোলা ফোলা, গোল গোল হাত পা, এমন কি রংটাও ফর্সা। দোকানের কর্মচারী নিপুণভাবে দুহাত পিছমোড়া করে বেঁধে গাড়ির পিছনে তুলে দিল। সেখানে পড়ে থেকে বাচ্চাটা পিট পিট করে তাকিয়ে থাকলো। কপালে লোহার শিক পুড়িয়ে যে নাম্বারটা দেয়া হয়েছিল সেটা না থাকলে তাকে দিব্যি মানুষের বাচ্চা বলে চালিয়ে দেয়া যায়।

বাসায় এসে শুনি এইমাত্র টেলিফোন এসেছে আমার ছোট ভাইকে রাস্তার মোড়ে কে একজন গুলি করে গেছে, সে হাসপাতালে আছে, অবস্থা খুব খারাপ।

বিপদে পড়লে আমার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমি ঘটনাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলাম। গুলি লেগেছে মাথায়, গুলি করেছে তার স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামী জামশেদ, সচরাচর যা হয়ে থাকে। সে যে এর মধ্যে মারা গেছে তাতে আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম। হাসপাতালে যাবার আগে আমি পুলিশে ফোন করলাম। ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর খবর নিলাম, বেচারী খুব ভীত হয়ে পড়েছে। বললাম, বোধ হয় মারা গেছে, মাথায় গুলি লেগেছে কিনা—

আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু—ভীতভাবে চারদিকে তাকিয়ে বলল, জামশেদ আমাকে পেলেও মেরে ফেলবে।

আমি অভয় দিয়ে বের হয়ে এলাম। হাসপাতালে গিয়ে দেখি আমার অনুমান সত্যি। ছোট ভাইটির মৃতদেহ সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। আমি চাদরের এক কোণা তুলে মুখটা দেখলাম, বিবর্ণ হয়ে আছে—নীল ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে ভেতরে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে।

পুরো ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিটিয়ে ফেলতে চারটি দিন ব্যয় হয়ে গেল। এ কয়দিন

বাসায় রান্না পর্যন্ত হয়নি। হোটেল থেকে খাবার এনে খাওয়া হয়েছে। সব ঝামেলা চুকে গেলে আমি পরিপূর্ণ একটি ঘুম দিয়ে উঠে স্ত্রীকে বললাম, ভালো কিছু রান্না করতে। ঠিক তক্ষুণি আমার মনে হলো সবাই মিলে খাওয়ার জন্যে একটা মানুষের বাচ্চা কিনে এনেছিলাম। এতক্ষণে সেটি নিশ্চয়ই মরে আছে। এ কয়দিন এটাকে খাবার পানি কিছুই দেয়া হয়নি। স্টোর রুমে গিয়ে কুঠুরিটা খুলে দেখি ময়লা-নোংরার ভেতর বাচ্চাটা মরে পড়ে আছে। হাত-পা'র বাঁধন খুলে দেয়ার কথা কারো মনে ছিল না।

স্ত্রীকে ডেকে বললাম, ওটাকে ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা করো, মরে গেছে।

তাই নাকি? বলে সে কৌতূহলী হয়ে কুঠুরিতে ঢুকলো। খানিকক্ষণ পর ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল—এখনো মরেনি, হার্টবিট পাওয়া যাচ্ছে।

আমি অবাক হলাম। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পনেরো মিনিট ওভাবে থাকলে আমি মারা পড়তাম। আর এই ছেলেটি চারদিন এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত খায়নি। অথচ এখনো বেঁচে আছে। আশ্চর্য এদের জীবনীশক্তি।

দেখে যাও কি রকম করছে ছেলেটা।

দেখে কি হবে? ফেলে দিতে বলো। মরে যাবে কিছুক্ষণের ভেতর।

জ্যান্ত অবস্থায় ফেলে দিই কি করে?

পা দিয়ে মিনিটখানেক গলায় চাপ দিয়ে রাখো, মরে যাবে।

আমার স্ত্রী কি ভেবে ওটার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে খোলা জায়গায় নিয়ে এল।

পুরানো চট দিয়ে সারা শরীর ঢেকে খানিকটা গরম দুধ খাওয়ালো। কি একটা বলকারক টনিক ঘড়ি ধরে দুঘণ্টা পর পর তার মুখে ঢেলে দিতে লাগলো। যত্নআত্তি দেখে মনে হলো নিজের ছেলের অসুখ করেছে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে ছেলেটা কিছু দিনেই সুস্থ হয়ে উঠল। দুসপ্তাহ পরে দেখি গায়ে আবার মাংস লেগেছে—চোখমুখে একটা সতেজ ভাবও ফুটে উঠেছে। কোন এক রবিবার দেখে ওটাকে জবাই করতে বললাম—কিন্তু আমার স্ত্রী কেন জানি রাজি হল না।

প্রথমে বুঝতে পারিনি, কিন্তু বাবুলের জন্ম বার্ষিকীতেও যখন ওটাকে জবাই না করে আরেকটা বাচ্চা কিনে এনে রান্না করল, তখন বুঝতে পারলাম ওর ছেলেটার প্রতি মায়া পড়ে গেছে। ব্যাপারটা ছেলেমানুষীতে ভরা—আমি স্ত্রীকে রীতিমতো ধমক দিলাম—সে কানেই তুললো না। হতভাগা ছেলেটা দিব্যি খেয়েদেয়ে নাদুসনুদুস হয়ে উঠতে লাগলো।

একদিন দেখি ওটাকে একটা হাফ প্যান্ট পরিয়েছে। ছেলেটা অবশ্যি তক্ষুণি প্যান্টটা ছিঁড়ে ফেলল। আরেকবার পরাতে গেলে আমার স্ত্রীর হাত কামড়ে দিল। আমি স্ত্রীকে আরেকবার বকে দিলাম—এসব বাড়াবাড়ির কোনো মানে হয় না। এই বুনো

ছেলেটাকে আদর যত্ন করলেই সে আইনস্টাইন হয়ে উঠবে না, একটা ভালো জাতের শিম্পাঞ্জি হতে পারে বড়ো জোর। আমার স্ত্রী এসব কথা কানেই তুললো না—মেয়েদের বিশেষ করে আমার স্ত্রীর প্রায় সময়েই এ রকম অর্থহীন জেদ দেখা যায়।

বেশ কয়দিন পরে লক্ষ করলাম—বুনো ছেলেটাকে নাম দেয়া হয়েছে জংলী। আর কি আশ্চর্য, জংলী বলে ডাকতেই মুখ তুলে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসে। প্যান্ট পরানো শিখিয়ে, চুল ছেটে ওটাকে দিব্যি মানুষের মত করে তুলতে আমার স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ওর রকম-সকম দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ওটাকে কি বাবুলের সাথে স্কুলে পাঠাবে নাকি?

আমার স্ত্রী উত্তর দিল না। জংলী অবশ্যি আমার স্ত্রীর খুব বাধ্য হয়েছে—ডাকতেই ছুটে যায়, ডিগবাজী দিয়ে, লাফিয়ে, কুদিয়ে স্ত্রীকে খুশী করার চেষ্টা করে। আমি একদিন মাথায় হাত বুলাতে গিয়ে একটা আঁচড় খেলাম। এরপরে ওটাকে দেখলেই আমার পিত্তি জ্বলে যেতো।

আমাকে রাগাবার জন্যেই কি না জানি না, জংলী কথা বলা শিখতে শুরু করল। খিদে লাগতেই তার স্বরে চেঁচাতো, ভাত ভাত ভাত আর তার মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলেই গলা ফাটিয়ে বলতো, না, না, না—

ঠিক এই সময় একদিন রাতে আহসান এসে হাজির। আহসান আমার বিশিষ্ট বন্ধু—সম্পর্কে আমার স্ত্রীর বড়ো ভাই। কি একটা বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত, বোমা রিভলবার নিয়ে কারবার। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে বলল, শেষ রাতে চলে যাব, খুব ভালো করে খাইয়ে দাও এক পেট।

ওকে থাকতে বলা বৃথা। কিন্তু এতো রাত্তিরে খাবারের আয়োজন করাও ঝামেলার ব্যাপার। আমার স্ত্রী এসে বলল, কি করি বলো তো—দাদাকে খাওয়াই কি দিয়ে?

তাই তো? হঠাৎ আমার জংলীর কথা মনে হলো। কেন, জংলীকে জবাই করো!

আমার স্ত্রী চমকে উঠে বলল, না, না।

না—না। মানে?

জংলীকে জবাই করবে কি?

আরে! আমি বিস্মিত হলাম, ওকে সারা জীবন ধরেই পালবে নাকি?

আমার স্ত্রী চুপ করে রইল।

আমি বললাম, যাও, জবাই করতে বলো, ভাত চড়িয়ে দাও।

না, জংলীকে জবাই—

এমন সময় আহসান এসে ঢুকলো। জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে?

কিছু না, কিছু না দাদা তুমি বসো গিয়ে—আমার স্ত্রী কথাটা চাপা দেয়ার চেষ্টা

করতে করতে আমার দিকে করুণ চোখে তাকাল—আমি যেন আহসানকে ব্যাপারটা না বলি। হয়তো আহসানকে এ বিষয়ে কিছু বলতাম না, কিন্তু পুরো ব্যাপারটা এতো ছেলেমানুষী যে না বলে পারলাম না। আর আমার স্ত্রী আহসানের কথাগুলো বেশ মেনে টেনে চলে। এবারে একটু উপদেশ দিয়ে দিক ছেলেমানুষী ঝেড়ে ফেলতে।

সব শুনে আহসান হো হো করে হেসে উঠল। আমার স্ত্রীর পিঠ চাপড়ে বলল, তুই এখনো আগের মতোই আছিস—একবারে ছেলেমানুষী! পৃথিবীতে কতো দুঃখ-কষ্ট আছে, এসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে আবেগপ্রবণ হলে চলে?

আহসান জংলীকে জবাই করার সময় মাথাটা ধরে থাকলো, নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে সব রকম কাজই শিখেছে—কোন কাজকেই আর ছোট মনে করে না। গলায় পোচ দেয়ার পর ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্ত এমন চমৎকারভাবে গড়িয়ে বেসিনের দিকে ঢেলে দিল যে প্রশংসা না করে পারলাম না। হতভাগা জংলীটা সারাক্ষণ চেঁচিয়ে গেল। গলায় পোচ দেয়ার পর ড্যাব ড্যাব করে আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল, আর আমার স্ত্রী বেচারী ঠোঁট কামড়ে অনেক কষ্ট করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হাজার হলেও ছেলেমানুষ, মোরগ জবাই করা দেখলেও শিউরে ওঠে। আর জংলীর ব্যাপার তো একটু অন্য রকমই।

রান্না শেষ হতে অনেকক্ষণ লাগলো। খুব চমৎকার রান্না হয়েছিল। আমি আর আহসান খুব আনন্দ করে খেয়েছিলাম। আমার স্ত্রী খেতে পারেনি—সারাক্ষণ পাঁজরের একটা হাড় নিয়ে খাবার ভান করেছে। আমি অবশ্যি কিছু বলিনি। মানুষের মন বড়ো বিচিত্র জিনিস, কখন কিসের জন্য যে সেটা খেপে ওঠে বলা মুশকিল।

প্রথম প্রথম ঘটনাটা স্মরণ করে আমার স্ত্রী লজ্জা পেতো। অনেকদিন হয়ে গিয়েছে, এখন আর লজ্জা পায় না, নিজেও ব্যাপারটা নিয়ে হাসি-তামাশা করে। সত্যি, মানুষ মাঝে মাঝে কি ছেলেমানুষীই না হয়ে যায়!

ব্যাধি

মন্টু ঘরে ঢুকে আমার বিছানায় চুপচাপ বসে থাকলো। তারপর বিড়বিড় করে বলল, কিছু ভালো লাগছে না। কথাটা ও ঠিক আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেনি। বললেও আমি এ কথার কোনো উত্তর দিতাম না। প্রতিদিন অনেক মানুষ এই অর্থহীন কথাটা অনেকবার করে বলে অথচ এই ভালো না লাগার কোনো প্রতিকার নেই।

মন্টু আমার দিকে তাকাল—কিন্তু আমাকে ঠিক দেখল বলে মনে হলো না, তারপর একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। বাম হাতটা বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখে ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো। ভঙ্গিটা হলো অনেকটা অসহায় মানুষের মতো।

মন্টু সেভাবে শুয়ে থাকলো, আমিও চুপচাপ বসে রইলাম। আমরা অনেক সময় এভাবে চুপচাপ বসে কাটিয়ে দিই। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না ঠিক তা নয়, অনেক সময় কথা বলার প্রয়োজন হয় না। আমরা দুজন পরস্পরকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি, তাই কথা বলা ইত্যাদি অনেক সময় দুজনের কাছেই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। অথচ সে সময় তৃতীয় কোনো ব্যক্তি থাকলে আমরা দুজনেই প্রচুর কথা বলি। আবার এমন সময়ও আসে যখন দুজনে ঘন্টার পর ঘন্টা একটা অর্থহীন বিষয় নিয়ে নির্বোধের মতো তর্ক করতে থাকি এবং তৃতীয় কোন ব্যক্তি আসলে আমরা আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় চুপ করে যাই।

কিন্তু এ মুহূর্তে মন্টুর এই অসহায়ভাবে শুয়ে থাকার ভঙ্গিটা আমাকে ধীরে ধীরে উৎকণ্ঠিত করে তুলছিল। আমি মাঝে মাঝেই এইরকম অর্থহীন উৎকণ্ঠায় ভুগি। মনে আছে, মাসখানেক আগে আমার একবার ধারণা হয়েছিল আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি। মন্টু সম্পর্কে এই উৎকণ্ঠা এবারেও সেরকম অর্থহীন হবে এরকম

একটা ধারণা নিয়ে আমি মন্টুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। মন্টু একটুও না নড়ে অনেকক্ষণ সেভাবে শুয়ে রইল। যতই সময় যেতে লাগলো আমি ততই অস্থির হয়ে উঠতে লাগলাম কিন্তু তাকে ডাকার সাহস পাচ্ছিলাম না। কেন জানি আমার ভয় করছিল। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ মন্টু একটু নড়ে উঠে ধীরে ধীরে ঘুরে আমার দিকে তাকাল—আমি অবাক হয়ে, ভয়ানক অবাক হয়ে দেখলাম মন্টু মারা যাচ্ছে।

মন্টু যে এভাবে মারা যাবে এটা আমি জানতাম। ওর এতটুকু উচ্চাশা নেই। ওর বয়স চব্বিশ। বাইশ বছর বয়সে ওর টিবি হয়েছিল—একটা ফুসফুস হারিয়ে ও এক বছর স্যানিটোরিয়ামে কাটিয়েছিল, শুধু ভালো হয়েই ও সন্তুষ্ট রয়েছে। যে মেয়েটাকে ভালোবেসে সে মেয়েদের ঘৃণা করতে শুরু করেছে—সেই মেয়েটা প্রকৃত অর্থে ওকে ভালোবাসে জানার পর থেকে ওর আর কোনো নারী সংক্রান্ত মোহ নেই। যে চাকরিটা পেলে সে একটা সিগারেটের আগুন দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরানোর বিলাসিতাটুকু করে যেতে পারবে গত পরশু তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসেছে। ওর একটা ছোট ভাই মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল। মাত্র মাসখানেকের আগে সে তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে।

আমি মন্টুকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি এই কয়টা বিষয় ছাড়া ওর আর অন্য কিছুতে উৎসাহ নেই। কাজেই আমি জানতাম ও শীঘ্রই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে—খুব শীঘ্রই।

হতাশাগ্রস্ত মানুষ চুপচাপ মারা যায়। আমি তাই দেখে এসেছি, আমার বাবাও তাই দেখে এসেছেন, তাঁর বাবাও। কাজেই মন্টু এখন আমার বিছানায় শুয়ে চুপচাপ মারা যাবে। আমি ইচ্ছে করলে তাকিয়ে দেখতে পারি ইচ্ছে না করলে বাইরে চলে যেতে পারি—মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করতে। খুব বেশি হলে এসব মৃত্যু বারো ঘণ্টা সময় নেয়, মন্টুর এতো লাগবে না, ওর জীবনীশক্তি কম। ওর মা'কে খবর দিতে পারি—মেয়েমানুষ, বিশেষত যারা মা, তারা এসব ব্যাপারে ভীষণ আবেগপ্রবণ। শীলাকেও জানাতে পারি—খুব আঘাত পাবে নিশ্চয়ই, তবুও জানানো উচিত। সহজ ভদ্রতা হিসেবে একজন ডাক্তার ডাকতে পারি, কিছু স্যালাইন উত্তেজক ওষুধ এসব দেয়ার জন্যে। খোদা বিশ্বাস করলে খানিকটা ধর্মীয় ব্যাপারের আয়োজন করতে হতো। মন্টু কারো কাছে টাকা ধার করেছিল কিনা জেনে রাখা উচিত—শোধ করে দিতে হবে।

আমি এসব কথা চিন্তা করছিলাম—কিন্তু বুঝতে পারছিলাম আমি মন্টুকে বাঁচানোর কথা ভাবছি। মন্টুর মা'কে কিংবা শীলাকে খবর দিলাম না, ডাক্তারও ডাকতে গেলাম না।

মন্টুর কাছে গিয়ে মন্টুকে ডাকলাম,

—মন্টু।

—কি? ওর গলার স্বর আশ্চর্য নির্লিপ্ত।

—ওঠ।

—না।

—আমি বলছি, উঠে দাঁড়াও।

মন্টু আমার দিকে তাকাল। চোখে চোখ রেখে বলল, না। আমি তার কলার চেপে ধরে টেনে বসালাম, তুমি জানো তুমি মারা যাচ্ছ?

—জানি। কলার থেকে সে আমার হাত সরিয়ে দিল। আমি বাচ্চা খোকা নই।

—মন্টু। আমার চোখের দিকে তাকাও।

—নাটুকেপনা ছেড়ে দাও। মন্টু আবার শুয়ে পড়লো। আমার ক্লান্তি লাগছে।

—ক্লান্তি লাগছে কারণ তোমার সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তুমি মারা যাচ্ছ।

—হতে পারে।

—মৃত্যু ভীষণ বিভীষিকাময়, মন্টু।

—তাই নাকি?

—তুমি নাস্তিক—ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন না।

—নাস্তিকের ঈশ্বর থাকে না।

—তোমার বয়স মাত্র চব্বিশ।

—আমার ছোট ভাইয়ের বয়স আঠারো ছিল।

—সে তো ইচ্ছে করে মরেনি, তাকে মারা হয়েছিল।

মন্টু চোখ তুলে তাকাল, আমি কি ইচ্ছে করে মারা যাচ্ছি?

—একশোবার। তুমি বাঁচতে চাইলেই বাঁচতে পারো। মন্টু, ভেবে দেখো—আমি মোটামুটিভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম, জীবন কতো আনন্দের।

মন্টু অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, সত্যি জীবন কতো আনন্দের?

ওর আশ্চর্য দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আমার সন্দেহ হতে লাগলো সত্যি জীবন আনন্দের?

—বেঁচে থাকলে সুখ আসে দুঃখ আসে, হাসি-আনন্দ গান আসে—আমি ওকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম, পাপ আসে পুণ্য আসে, লোভ, লালসা প্রেম আসে, ঘৃণা আসে—

মন্টু বিড়বিড় করে বলল, হতাশাও আসে।

—হ্যাঁ, হতাশাও আসে। কিন্তু মৃত্যুতে কি আসে? সব কিছুর শেষ আসে। তাহলে কেন তুমি মারা যাবে?

মন্টুর ওপর আমার কথার কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। আপন মনে বলল, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য এসব বাজে কথা। আসলে সবই আপেক্ষিক হতাশা। কখনো কম, কখনো বেশি।

আমি হতাশ হলাম। ওর মনে মৃত্যুবিভীষিকা নেই, জীবনের প্রতি কোনো মোহও নেই অথচ ওর শরীর ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আসছে। আর কেউ নয় শুধু সেই পারে ওর শরীরকে উষ্ণ করে তুলতে। কিন্তু ওর মনে সে ইচ্ছে জাগাবে কে?

—মন্টু, শীলা তোমাকে ভালোবাসে।

—ভালোবাসার কোনো অর্থ আছে? পাশাপাশি শোওয়া ছাড়া ভালোবাসায় আর কি হয়?

আমি একটু উত্তেজিত হয়ে গেলাম, তোমার সেসব দিনের কথা মনে নেই? যখন শীলার কথা ভেবে যন্ত্রণা পেতে তোমার ভালো লাগতো?

—আছে। কিন্তু তার জন্যে তো আমার আর কোনো মোহ নেই।

—মন্টু, তুমি না বলেছিলে একটা উপন্যাস লিখবে?

—হুঁ, বলেছিলাম।

—লিখবে না?

অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, হেমিংওয়েও তো উপন্যাস লিখেছিল।

—তাতে কি হয়েছে? তুমি লিখবে না?

—হেমিংওয়েও তো মারা গেছে। মাথায় গুলি করে।

—কি আশ্চর্য? তাতে কি হয়েছে? মারা যাবে বলে উপন্যাস লিখবে না? সবাই তো মারা যাবে।

—অথচ কি মজার ব্যাপার, সবাই এমন ভাব করে যাচ্ছে যেন কেউ কোনোদিন মারা যাবে না। সবাই গান গায়, হাসে, বই পড়ে, খেলাধুলা করে, খায়, ঘুমায়। কি আশ্চর্য।

আমি দুমিনিট সময় হতাশা কতটুকু গভীর হলে কেউ এরকম করে ভাবতে পারে, এটা চিন্তা করে দেখলাম।

—মন্টু, গান শুনবে?

—না।

—রবীন্দ্র সঙ্গীত? সখী ভাবনা কাহারে বলে—

—না।

—পপ সং? জপলিন, জিমি ও হেনড্রিক্স?

—না।

—একটা গল্প পড়ে শোনাব? সাত্রের? ইনটিমেসী?

—না।

—একটা কবিতা পড়বো? র‍্যাবোর? মা বোয়েম?

—না।

—কিছু খাবে?

—না।

—একটা কিছু খাও—মিষ্টি? ঝাল?

—না।

—সিগারেট?

—না।

—মদ খাবে? হুইস্কী বিয়ার?

—না।

—এবসাঁত?

—না।

—এল এস ডি?

—না।

—বিষ খাবে? সায়নাইড?

—না।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম বিষ খাবে? বিষ?

—কি হবে খেয়ে? মন্টু দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

সত্যিই তো কি হবে খেয়ে? আর ছ'ঘণ্টার ভেতর ও এমনিতে মারা যাবে। ওর চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। হৃদস্পন্দন ধীরে ধীরে কমে আসছে। হাত-পা অনেক ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ওর চোখে মুখে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঠোঁট দুটো শুকনো। একটু নীলাভ। ও কেন আর শুধু শুধু বিষ খাবে?

আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। এখন ওর মা'কে খবর দেয়া উচিত। আর শীলাকে। ডাক্তারকেও বলা উচিত। স্বাভাবিক সৌজন্যবশত। অন্তিম ইচ্ছে শুনে রাখা উচিত—কথাটি মনে হতেই আমি হাসলাম। এসব লোকদের কোন ইচ্ছে থাকে না, একটা ইচ্ছেও যদি থাকতো সেটাকে আঁকড়ে ধরেই ওরা বেঁচে উঠতে পারতো। কিন্তু ইচ্ছে তৈরি করা যায় না? অন্য ইচ্ছে না হোক একটা প্রবল যন্ত্রণা উপশমের ইচ্ছেও কি ওদের হয় না? একটা যন্ত্রণা দিয়ে দেখা যায় না?

আমি বাক্স খুলে একটা চাকু বের করলাম। পেশাদার গুণ্ডাদের যেসব চাকু থাকে সেই ধরনের। কর্কশ শব্দ করে চাকুর ধারালো ফলাটা খুলে ফেললাম—মন্টু নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে রইল।

মন্টু, তোমার হাতটা পেতে দাও তো।

মন্টু খুব ধীরে ধীরে হাতটা টেবিলের উপর রাখলো। ও ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে।

আমি মন্টুর চোখের সামনে চাকুর ধারালো ফলা দিয়ে ওর হাতটা গভীরভাবে চিরে ফেললাম। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল—মন্টু যন্ত্রণায় তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল।

হাতটা সরিয়ে নিতে চাইলে আমি চেপে ধরে রাখলাম। তার মুখ ঘামে ভিজে উঠেছে। ভুরু দুটো কুঁচকে একটা কান্নার ভঙ্গি হয়ে রয়েছে।

—মন্টু?

—কি? কথা বলতে গিয়ে ও হাঁপাচ্ছে।

—যন্ত্রণা করছে?

—হ্যাঁ।

—আরো কাটব?

—না।

আরো একটু কাটি?

মন্টুর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হল। বলল ঠিক আছে, কাটো। আমার হঠাৎ করে মন্টুর জন্যে ভীষণ মায়া হল—ইচ্ছে হলো ওকে শিশুর মতো আদর করি। কিন্তু তা না করে ওর হাতটা টেবিলে বিছিয়ে, চাকুটা শক্ত হাতে ধরে প্রাণপণে বসিয়ে দিলাম। একবার দু'বার বারবার। অনুভব করলাম চাকুর ফলা মাংস কেটে নিচের টেবিলে শক্ত কাঠে বসে যাচ্ছে। একবার এতো শক্ত হয়ে কাঠে বসে গেল আর টেনে তুলতে পারলাম না।

মন্টুর দিকে তাকালাম। চোখ বিস্ফোরিত—ঠোঁট সজোরে কামড়ে ধরা, সারামুখ পাথরের মতো শক্ত-রক্তহীন, তার উপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আস্তে আস্তে তার চোখ কেঁপে উঠল—তারপর হঠাৎ একটা অমানুষিক আর্তনাদ করে উঠলো।

—মন্টু, মন্টু, কি হয়েছে?

—ছেড়ে দাও, মরে যাবে।

আমি ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে চাকুটা খুলে বের করে আনলাম। সাথে সাথে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো—। একটা তোয়ালে শক্ত করে চেপে ধরলাম। দেখতে দেখতে চমৎকার লাল রংয়ে সেটা ভিজে উঠতে লাগলো।

—মন্টু, কি রকম লাগছে? মন্টু হাঁপাতে লাগলো।

—ভীষণ যন্ত্রণা করছে। অসহ্য।

—ডাক্তার ডেকে আনব?

—আনো। তাড়াতাড়ি। মরে যাচ্ছি, রক্ত বন্ধ করতে না পারলে মারা যাব। আর্টারী কেটে গেছে।

আমি দেখলাম উপুড় করা বোতলের মতো ওর শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে আসছে। আর কি আশ্চর্য! মন্টু বাঁচতে চাইছে। আমি একবার শিউরে উঠলাম। মন্টু বাঁচতে চাইছে!!

আমি দরজা খুলে উন্মাদের মতো ছুটলাম। ডাক্তার দরকার, একজন ডাক্তার।

অন্ধকারে একা

এই সমস্ত বাসাটায় আমি একা। আমার ধারণা ছিল নির্জনতা আমাকে আনন্দ দেবে—প্রথম সত্যিই দিয়েছিল; কিন্তু এখন এই মধ্যরাতে আমি নিঃসঙ্গ অনুভব করতে লাগলাম। নিঃসঙ্গতা আর নির্জনতা এক জিনিস নয়, নির্জনতা থেকে হয়তো মুক্তি পাওয়া যায় কিন্তু নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু এখন এই মধ্যরাতে (একটু আগে আমি গুনে গুনে বারোটি ঘন্টা শুনেছি) ঘুম না আসা পর্যন্ত আমি নির্জনতা বা নিঃসঙ্গতা কোনোটি থেকেই মুক্তি পাব না। দোতলার অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি একে একে সব বাসার বাতি নিভে যেতে দেখলাম। আকাশে মেঘ করেছিল, আমার চোখের সামনে বিজলি চমকালো, বহুদূর থেকে গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল। তারপর ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। লাইটপোস্টের ঝাপসা আলোয় বৃষ্টিভেজা চকচক ফাঁকা রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। বিনা কারণে আমার মন খারাপ হয়ে যেতে লাগল।

আমি ঘরে এসে একে একে সব ঘরের বাতি জ্বালালাম। তারপর এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমি লক্ষ করে দেখেছি অর্থহীন কাজে মাঝে মাঝে আশ্চর্য অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমে আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছিলাম। কোনো ঘরেরই কোনো জিনিস আমার চোখে পড়ছিল না। অনেকক্ষণ পর একটা একটা করে জিনিস আমার চোখে ধরা পড়তে লাগল। বসার ঘরে এসে দেখলাম জানালার পর্দাটা ভীষণ লাল, একটা কালচে ভাব আছে, প্রথমেই রক্তের কথা মনে হয়। শোকেসের পুতুলগুলো প্রথমবারের মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। কোনো কোনোটি নিখুঁত মানুষের প্রতিলিপি অথচ আশ্চর্য প্রাণহীন। এরপরে বুকশেলফের বইগুলো আমার নজরে পড়ল। সঞ্চয়িতার প্রুপ কে দেখেছিল—কথাটা অকারণেই অনেকক্ষণ আমার মনে ঘুর

ঘুর করলো। দেয়ালে অয়েল পেন্টিং, একটা পানির গ্লাসের পিছনে খবরের কাগজ, একটা কলা আর সিগারেটের প্যাকেটের কম্পোজিশন। কখনোই এই সাধারণ জিনিসগুলো এরকম সাজানো অবস্থায় পাওয়া যায় না আর এখানে যেসব রঙ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো কখনো খালি চোখে ধরা পড়ে না। আমার চোখ পরের ছবিতে সরে গেল, টিপুর আবক্ষ একটা ছবি, ওয়েল পেন্টিং। আঁকা ছবিতে মানুষের চেহারা নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে কিন্তু তবু সেটা ছবি হয়ে থাকে। একটা মানুষ যে দেয়ালে ফ্রেম বন্দী হয়ে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকে একটুও নড়ে না সেটা কারো মনে অস্বস্তি জাগায় না। কিন্তু টিপুর এই ছবিটিতে একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্যে ওটা দেখলেই আমার অস্বস্তি হয়, মনে হয় এক্ষুণি হয়তো নড়ে উঠবে। প্রথম আরো বেশি হতো—এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। মধ্যরাতে টিপুর ছবিটা দেখে আমার সেরকম কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না, শুধু মনে হলো টিপু বেঁচে থাকলে এখন উগ্র বামপন্থী রাজনীতি করত। আমার বোধ হয় একটু দুঃখ দুঃখ লাগছিল। কারণ কেন জানি টিপুর মৃতদেহের কথা মনে পড়ে গেল। পানিতে ভেসে ভেসে মুখের উপর থেকে হালকা সাদা চামড়া উঠে আসছিল, বুক খোলা সার্ট, বুকে কয়েকটা ফুটো, ভালো করে না তাকালে বোঝা যায় না। আমি চোখ সরিয়ে কোণের চিনামাটির মূর্তিটির দিকে তাকালাম। খানিকক্ষণ পর লক্ষ করলাম আমি টিপুর কথাই ভাবছি, চিনামাটির বিবসনা নারী-মূর্তিটির দিকে তাকিয়েও আমি ওটি দেখছি না।

আমি আবার এ ঘর থেকে ও ঘরে হাঁটা শুরু করলাম। যখন তৃতীয়বারের মত ঘরের শেষ মাথায় পৌঁছেছি তখন স্পষ্ট শুনতে পেলাম কে যেন বাইরের ঘরের দরজা ধাক্কা দিল। মুহূর্তে আমার সমস্ত স্নায়ু সতর্ক হয়ে উঠল। এই ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে রাত বারোটায় আমার কাছে কে আসতে পারে? ভেবে দেখলাম, কেউ না। তাহলে কি কোনো জরুরি সংবাদ বা সেরকম কিছু? কিন্তু তাহলে দরোজায় ধাক্কা পড়তো জোরে জোরে ঘন ঘন—জরুরি সংবাদের মতোই। কিন্তু শব্দটি হয়েছে দ্বিধান্বিত কোনো মানুষের। আর সবচেয়ে বড় কথা দরোজা ধাক্কা দেয়ার এই ধরনটি আমার খুব পরিচিত—শুধু আমি মনে করতে পারছিলাম না।

ঠিক এই সময় আবার দরোজায় শব্দ হলো। আস্তে আস্তে দ্বিধান্বিত ভাবে আর সাথে সাথে আমার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি বুঝতে পারলাম কে এসেছে!

আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল, নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমি দরোজা খুলে দিলাম—লক্ষ্য করলাম আমার হাত অল্প অল্প কাঁপছে।

দরোজার সামনে টিপু দাঁড়িয়ে আছে, লাল রংয়ের শার্টটা ভিজে গিয়ে কোথাও কোথাও গায়ের সাথে লেপটে আছে। ভিজে চুল কপালে এসে পড়েছে। চিবুক বেয়ে পানি পড়ছে। টিপু আমাকে দেখে বিব্রতভাবে হাসলো। আমি দরোজা ফাঁক করে বললাম, ভেতরে আয়।

ভিজে গেছি। বলে টিপু আবার হাসল।

আমি স্পষ্ট দেখছি ও ভিজে গেছে, কথাটা বলার কোনো দরকার ছিল না। টিপু ভেতরে এল, রুমাল দিয়ে মাথাটা মোছার চেষ্টা করলো তারপর শার্টের কয়েকটা বোতাম খুলে ভিজে শার্টটা বুকের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলল। আমি ওকে লক্ষ্য করছিলাম, ঠিক আগের মতো আছে, এতোটুকু বদলায়নি। চোখে চোখ পড়তেই কেন জানি লজ্জা পেয়ে হাসল। আমি হাসলাম না, মুখ কঠোর করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। লক্ষ করলাম আমার কঠোর দৃষ্টির সামনে ওর হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে, বিব্রতভাবে কুঁকড়ে উঠে ধীরে ধীরে একটা অপরাধী অপরাধী ভাব ফুটে উঠছে। এক সময় ওকে ভেঙ্গে পড়ার পূর্বমুহূর্তের একজন হতাশ তরুণের মতো দেখাতে লাগল।

কেন এসেছিস?

নির্জন ঘরে আমার গলার স্বর মায়াদয়াহীন, রুক্ষ নীরস ধাতব শব্দের মতো শোনাল। টিপু অপ্রস্তুত, একটু আহত হয়ে বলল কেন, কি হয়েছে?

ওর গলার স্বরে এমন একটা নির্দোষ সারল্য মাখানো ছিল যে আমার মুহূর্তের জন্যে মনে হলো সত্যিই বুঝি কিছু হয়নি, সত্যিই বুঝি টিপু বেঁচে আছে, ওর অপরাধ শুধু রাত করে বাড়ি ফেরায়, বৃষ্টিতে ভিজে আসায়। আমি মুখ শক্ত করে বললাম, তুই মরে গেছিস।

টিপু মাথা নাড়ল। আমি কঠোর গলায় বললাম, আমি নিজে তোকে কবর দিয়েছি—

হুঁ! টিপু আমার দিকে তাকিয়ে রইল, কথাটা ও বুঝতে পারেনি।

আমাকে নির্দয়ের মতো কথাটা বুঝিয়ে দিতে হয়, তোর আসার কোন মানে নেই—তুই মিথ্যা তোর সবকিছু মিথ্যা—

টিপুর চোখ বেদনাতুর হয়ে উঠল, মনে হলো একটা দীর্ঘশ্বাস ও ফেলল।

বলল, সত্যি।

তুই চলে যা।

চলে যাব? টিপু চমকে উঠে এতো কাতর গলায় জিজ্ঞেস করলো যে আমি কঠোর হতে পারলাম না। ক্লান্ত গলায় বললাম, খানিকক্ষণ বোস তাহলে, জামাকাপড় শুকাক।

টিপু ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে সাথে সাথে সোফায় বসে পড়ল, তার পরেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। শোকেসের কাছে গিয়ে পুতুলগুলো দেখতে লাগল। জাপানি পুতুলটিকে বাইরে এনে অনেকক্ষণ লক্ষ করে আবার ঢুকিয়ে রাখল। বুকশেলফের কাছে এসে সায়েন্স ফিকশানগুলো টেনে বাইরে আনতে লাগল। এক সময়ে জিজ্ঞেস করলো, নূতন বই কিনেছ?

হুঁ।

কি কি?

আমি কয়েকটা বই বেছে বেছে বের করে দিলাম। টিপু বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বললো, আজিমভ দারুণ লেখে, না?

হুঁ।

এন্ড অব এটারনীটিটা কি সাংঘাতিক!

হুঁ।

বই দেখতে দেখতে হঠাৎ ওর চোখ পড়ল দেয়ালে ওর ছবিটার দিকে। বইগুলো শেলফের ওপর রেখে ছবিটার কাছে গেল। একনজর দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কে এঁকেছে?

ওর মুখ খুশীতে ঝলমল করছে। আমি বললাম, পিনু হক।

বাঃ! ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ ছবিটা দেখল। তারপর বলল, ভারী চমৎকার এঁকেছে তো! একেবারে আমার মতো হয়েছে!

খানিকক্ষণ পর ও ভেতরে গেল। বাইরের ঘরে বসে বসে আমি শুনতে পেলাম ফ্রীজ খুলছে, কি রান্না হয়েছে দেখছে! ট্যাপ খুলে কি যেন করলো, হাত ধুয়ে পানি খেল হয়তো—ভীষণ পানি খাবার অভ্যাস ছিল ওর! এরপর ও ভেতরের ঘরে গেল। আলমারি খুলল, তারপর বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম। অনেকক্ষণ খুটখুট শব্দ পেলাম, কিছু একটা দেখছে হয়তো—ও মারা যাবার পর অনেক কিছুই তো পালটে গেছে। এরপর পাশের ঘরে গেল, একটা জানালা খুললো। রেকর্ড প্লেয়ারে হঠাৎ একটা গান বেজে উঠল, নিশ্চয়ই বাজিয়ে দেখছে। হঠাৎ করে আবার রেকর্ড প্লেয়ার থেমে গেল—টিপুর সুরবোধ ছিল না। গান শুনে কোনোদিনই আনন্দ পায়নি!

হালকা সিস্ দিতে দিতে একটু পরে টিপু বাইরের ঘরে এসে হাজির হলো। ভারী নীল তোয়ালেটা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে আসছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে হলো ওকে কিছু জিজ্ঞেস করি, ও কেমন আছে, কিছু খাবে কিনা কিংবা এমনি ধরনের কোন প্রশ্ন। পর মুহূর্তে বুঝতে পারলাম এটা অর্থহীন। গত জুন মাসে ওর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পার হয়েছে—ও কেমন আছে জিজ্ঞেস করা অর্থহীন, ও কিছু খাবে কিনা জিজ্ঞেস করা আরো বেশি অর্থহীন। ও মারা গেছে এটাই সত্যি আর সব মিথ্যা, আমার সামনে বসে থেকেও ও মিথ্যা। আমি চুপ করে বসে রইলাম। আমার কেমন জানি একটু দুঃখ হতে লাগলো।

টিপু হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে জিজ্ঞেস করলো। অনেক রাত হয়েছে, না?

হুঁ।

তুমি ঘুমোবে না?

ঘুমোবো।

কখন?

এই তো—বলে আমি থেমে গেলাম।

টিপু অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে বসল। ও নিশ্চয়ই যেতে চাইছে না।

আমি স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। সেই চোখ, সেই হাত, সেই হাসির ভঙ্গি, সেই এলোমেলো চুল অথচ সব মিথ্যা! ইশ! ও যদি মারা না যেতো!

এক সময়ে টিপু উঠে দাঁড়ালো! বলল, আমি যাই তাহলে, তুমি ঘুমোও। আমি কথা না বলে ওর দিকে তাকালাম। ও বিষণ্ণভাবে হাসল। বুকশেলফের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ও একটা বই লুফোলুফি করলো তারপর ও ওর ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বুঝতে পারছি ও আমার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না—নিশ্চয় চোখে পানি এসে গেছে—ও বরাবরই এরকম ছেলেমানুষ। অন্যদিকে তাকিয়ে হঠাৎ দরজার কাছে এগিয়ে গেল, আমার দিকে না তাকিয়ে বলল, আসি। তারপর দরোজা খুলে বের হয়ে গেল। শেষবারের মতো ওর মুখটা দেখার অদম্য ইচ্ছে হলো। কিন্তু নিজেকে বোঝালাম, কি হবে দেখে? আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। মাথা নিচু করে বৃষ্টির মাঝে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে টিপু। ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা হঠাৎ বেড়ে উঠল—টিপু একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করলো, তবু ও ভিজে যাচ্ছে নিশ্চয়ই। আমি ভাবলাম ওকে ডাক দিই, বৃষ্টিতে ভিজে ওর অসুখ করবে, তারপরেই মনে হলো কি হবে ডেকে?

লাইটপোস্টের নিচে ওর লাল শার্ট, ভেজা চুল অস্পষ্ট দেখা গেল। তারপর ছায়াকে দীর্ঘতর করতে করতে ও হেঁটে যেতে লাগল। বৃষ্টির ভেতরে একা—আর একটু পরেই ও অন্ধকারে মিশে যাবে।

সোনারিলের শিশি

কাসেম তার পিঠের নিচে একটা বালিশ দিয়ে একটু সোজা হয়ে বসে। বিছানায় সেরকম আধশোয়া হয়েই সে জানালার পর্দাটা টেনে দিল। বাইরে এখনো আবছা অন্ধকার। কয়টা বাজে কে জানে! বালিশের নিচে হাত দিয়ে ঘড়িটা বের করে আনে কাসেম। ভোর পাঁচটা দশ। মঙ্গলবার সকাল পাঁচটা দশ। উনিশ শ বাহাত্তর সনের বারই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল পাঁচটা দশ। কাসেম খুব সাবধানে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—দিনটিকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই, কিন্তু কাসেম জানে আজ তার জীবনের শেষ দিন।

পৃথিবীর কয়জন মানুষ তার জীবনের শেষদিন আগে থেকে জানতে পারে? খুব বেশি নয়—কয়জন খুব সাবধানে চিন্তাভাবনা করে শেষ দিনটি ঠিক করে? মনে হয় আরো কম। কাসেম টেবিলের উপর থেকে সোনারিলের শিশিটা হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নেয়। ভেতরে তিরাশিটা ট্যাবলেট আছে, কাল রাতেই গুনেছে সে। ঘুম না আসলে তার দুটি খাওয়ার কথা—সে আজ তিরাশিটাই খাবে। ফার্মেসী ঘুরে ঘুরে তিরাশিটা ট্যাবলেট জোগাড় করতে তার বেশ কয়দিন লেগে গেছে। কেউই একসাথে বিক্রি করতে চায় না।

সোনারিলের শিশিটা হাতে ধরে রেখে কাসেমের কেমন জানি একটা আনন্দ হয়। প্রথম ভালোবাসার মতো আনন্দ। হাতের রগে সিরিঞ্জ দিয়ে মরফিন ঢুকিয়ে দেয়ার মতো আনন্দ। সে শিশিটা শক্ত করে ধরে রাখে। যেন হাত একটু আলগা করলেই হাতছাড়া হয়ে চলে যাবে।

কম্বলটা ভালো করে শরীরে জড়িয়ে নেবার সময় কাসেমের আবার মনে পড়ল তার ডান পা-টি হাঁটুর নিচে থেকে নেই। মনেই থাকে না মাঝে মাঝে, হঠাৎ চুলকাতে গিয়ে দেখে যেখানে পা থাকার কথা সেখানে আশ্চর্য শূন্যতা। যে পা-টি নেই সেটা চুলকায়

কেমন করে কে জানে? কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারলে হত। এ জীবনে আর জানা হল না। এ জীবনে বেশ অনেক কিছুই হল না। কানে শঙ্খ ধরে রাখলে সমুদ্রের শব্দ শোনা যায় কেন সেটাও তার জানা হল না। অনেক মানুষকে জিজ্ঞেস করেছিল কেউ বলতে পারেনি। 'রোমান হলিডে' নামে ছবিটাও তার দেখা হল না। খুব নাকি সুন্দর ছবি—একবার এসেও ছিল কাছাকাছি ঠিক তখন তার কি এক কাজে বরিশাল যেতে হল। এমন মেজাজ খারাপ হয়েছিল যে বলার মত নয়। 'থ্রী কমরেড' নামে একটা বই পড়েছিল—এমন সুন্দর একটা বই যে পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। লেখকের নাম এরিখ মারিয়া রেমার্ক। ইচ্ছে ছিল তার সব বই পড়ে ফেলবে। কিন্তু বাংলার অনুবাদ নেই বলে পড়তে পারল না। ইংরেজি পড়তে তার খুব কষ্ট হয়, ভাল করে ইংরেজিটা যদি শিখে নিতে পারত। এই জীবনে আর হল না। আর কী কী হল না তার এই জীবনে? কদমফুলের মত দেখতে নাকি একরকম মিষ্টি পাওয়া যায় নাম রস কদম, ভেবেছিল খেয়ে দেখবে জিনিসটা কেমন। সেটা খাওয়া হল না। শিরীনের সাথে যখন তার খুব ভাব ছিল তখন ভেবেছিল একদিন চুমু খেয়ে দেখবে তাকে—মেয়েদের চুমু খেতে কেমন লাগে। সেটাও হল না এই জীবনে।

কাসেম সাবধানে বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের করে দেয়, শিরীনের কথা মনে হলেই কেন জানি এখনো তার মন খারাপ হয়ে যায়। সে কি শিরীনের জন্যে এই তিরাশিটা সোনারিল ট্যাবলেট কিনে এনেছে? কাসেম অনেকটা আপন মনে মাথা নাড়ে। না শিরীনের জন্যে না—শিরীন তার পাঁজরটা ভেঙে দিয়ে গেছে সত্যি কিন্তু জীবন শেষ করে দেয়নি। শিরীন যদি থাকত তাহলে হয়তো তার তিরাশিটা সোনারিল ট্যাবলেট কিনতে হত না। কিন্তু শিরীন নেই বলে সে উনিশশো বাহাত্তর সনের বারোই ডিসেম্বর মঙ্গলবার জীবন শেষ করে দেবে বলে ঠিক করেনি।

কাসেম কম্বল সরিয়ে আলোতে তার পায়ের দিকে তাকাল। হাঁটুর নিচে কী সুন্দর করে কাটা। সার্জন ভদ্রলোকের হাত পাকা বলতে হবে। কমলাকান্দির যুদ্ধে গুলি লেগেছিল তার হাঁটুর নিচে। কী কষ্ট করে সবাই তাকে সরিয়ে নিয়েছিল। ডাক্তার নেই কিছু নেই—তার মাঝে লুঙ্গি ছিঁড়ে হাঁটুর নিচে বেঁধে দুইদিন দুই রাত্রি পর বর্ডার পার হয়ে হাসপাতালে। সময়মতো নিতে পারলে তার পা-টা কেটে ফেলে দিতে হতো না, কিন্তু কেমন করে নেবে? নদীর মাঝে মিলিটারির গানবোট ঘুরছে তার মাঝে প্রায় জান হাতে নিয়ে পালিয়ে এসেছে সবাই।

হাসপাতালে ডাক্তার যখন বলল তার পা-টা কেটে ফেলে দিতে হবে তখন তার একটু দুঃখও লাগেনি। কেন লাগবে? দেশের স্বাধীনতার জন্যে কত মানুষ তো মরেই গেল—আর সে একটা তুচ্ছ পায়ের জন্যে দুঃখ করবে? তখন মনে হয়েছিল জীবনটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। আর কি আশ্চর্য এক বছরের মাঝে সেই জীবনটা কেমন

বিষাক্ত হয়ে গেল যে সেটাকে তিরাশিটা সোনারিল ট্যাবলেট দিয়ে শেষ করে দেবে চিন্তা করতেই কেমন একটা অমানুষিক উল্লাস হচ্ছে।

দেশের জন্যে কি ভালোবাসাই না ছিল। দেশ যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে বিমূর্ত কোন জিনিস নয় যেন অসহায় ছোট একটা শিশুর মত—যেন বুকে ধরে বলা যায়, ভয় কি তোমার, আমি তো আছি। আহা! কি আশ্চর্য অনুভূতি? কতজনের ছিল এরকম অনুভূতি এরকম ভালবাসা?

কাসেমের জন্যে শিরীনেরও সেরকম ভালবাসা ছিল। সাতাশে মার্চ পালিয়ে যাবার আগে লুকিয়ে দেখা করতে গিয়েছিল, শিরীন তাকে জাপটে ধরে কি রকম করে কেঁদে উঠেছিল মনে আছে তার। তখন আস্তে করে শিরীনের ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে নিলে পারতো—আজ তাহলে না করা জিনিসের লিস্ট থেকে একটি জিনিস কমে যেতে পারতো।

জানুয়ারির প্রথম দিকে কাসেম ফিরে এসেছিল। শিরীনের সাথে যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল দৃশ্যটি এখনো তার স্পষ্ট মনে আছে। তাকে দেখে শিরীনের চোখে দুঃখ নয় কেমন যেন ভয়ঙ্কর একটা আতঙ্ক ফুটে উঠল। কাসেম যেন কাসেম নয়—সে যেন বিকৃত একটা প্রাণী। পঙ্গু মানুষ কি এতই কুশ্রী যে শৈশবের ভালবাসাকেও এক নিমেষে ধুলায় উড়িয়ে দেয়? ছয় মাস পর একদিন বিকেলে শিরীন দেখা করতে এসেছিল তার সাথে। মাঝে মাঝে কখনো তার সাথে দেখা হয়েছে, কখনো কেউ স্পষ্ট করে কিছু বলে নি কিন্তু দুজনেই জানতো আগের জীবন আর কখনো ফিরে আসবে না। কেন আসবে না সেটা নিয়ে কাসেম খুব ভেবেছিল কয়দিন কিন্তু কখনো কোনো প্রশ্ন করেনি। একজন পঙ্গু মানুষ খুব দুর্বল।

শিরীন অনেকক্ষণ তার সামনে বসে থেকে আস্তে আস্তে বলল, তুমি আমার উপর রাগ কর না, প্লীজ।

কাসেম জোর করে হাসার মত শক্ত করে বলল, রাগ করব কেন আমি?

শিরীন খানিকক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ তুলে বলল, অন্য কারো কাছ থেকে খবর পেলে তোমার আরো খারাপ লাগবে তাই আমি নিজেই এসেছি।

কি খবর জিজ্ঞেস করতে গিয়ে কাসেম থেমে গেল। শিরীনের বাম হাতের আঙুলে কি সুন্দর আংটি।

শিরীন আস্তে আস্তে বলল, আমি খুব সাধারণ মেয়ে। আমার তোমার মত সাহস নেই। তুমি আমার উপর রাগ কর না, প্লীজ।

কাসেম মুখে সহজ একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, ছেলে কি করে?

ডাক্তার।

ও।

আমাকে নিয়ে চলে যাবে।

কোথায়?

জার্মানি।

ও। একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, কবে?

সামনের মাসে।

কাসেম কি বলবে বুঝতে না পেরে বলল, জার্মানি খুব সুন্দর দেশ। তোমার খুব ভাল লাগবে। এরিক মারিয়া রেমার্কের দেশ। একটু থেমে কাসেম নিজের থেকেই যোগ করল, আমার ফেবারিট লেখক।

শিরীন আরো কিছুক্ষণ বসেছিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বিদায় নেবার জন্যে খুব কাছে এসে দাঁড়াল তার। সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কাসেম দেখতে পায় আস্তে আস্তে শিরীনের চোখ পানিতে ভরে যাচ্ছে।

কি ভয়ঙ্কর ইচ্ছে করছিল কাসেমের হাত দিয়ে শিরীনকে আঁকড়ে ধরে কাতর গলায় বলতে, আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না, প্লীজ।

কাসেম বলেনি, বলার সাহস হয় নি। পঙ্গু মানুষ খুব ভীতু মানুষ, খুব দুর্বল মানুষ। সহজ গলায় বলেছিল, আমাদের দুজনের ভেতর অন্তত একজন সুখী হোক! কি বলো?

শিরীনের সাথে আর তার দেখা হয়নি। কোথায় আছে এখন শিরীন? এরিক মারিয়া রেমার্কের দেশে এক সুদর্শন যুবকের বুকের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে কি এখন?

শিরীন চলে যাবার পর থেকেই কেমন জানি সবকিছু আরো বেশি ওলট-পালট হয়ে গেল। পড়াশুনায় এমন কিছু হাতি ঘোড়া ছাত্র ছিল না সে। কিন্তু তাই বলে সে একেবারে ফেল করে যাবে? ক্লাস করতে কি বিরক্তিই না লাগত—কি অর্থহীন ছেলেমানুষী মনে হত সবকিছু। যুদ্ধের বছরটায় তার বয়স যেন কত বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু আটকা পড়ে গেছে একটা কমবয়সী মানুষের শরীরে। একটার পর একটা জিনিস উল্টেপাল্টে গেল। এর মাঝে একদিন দেখল আদিল রহমানকে। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। বাসার সামনে দাঁড়িয়ে কাজের লোককে ধমকাধমকি করছে গেট খোলা রাখার জন্যে। এই লোক প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছে মানে? নিজে না মিলিটারির সাথে ঘুরে ঘুরে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের বাড়িতে আগুন ধরিয়েছে? সাথে সাথে কমান্ডারের কাছে গিয়েছিল কাসেম—কমান্ডার বারেক ভাই বললেন, দেখ কাসেম। যুদ্ধ তো শেষ, এখন দেশ গড়ার সময়। রাগ পুষে লাভ নেই বঙ্গবন্ধু নিজে বলেছেন—

কাসেম কেমন জানি নিজেকে ঘেন্না করতে শুরু করল সেই থেকে। চারজন মুক্তিবাহিনীর ছেলেকে খুন করিয়ে আদিল রহমান তো দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে! আর সে?

ঠিক কখন সে ঠিক করল মরে যাবে তার মনে নেই। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা

এসেছে তার ভেতর। একবার ঠিক করে নেবার পর হঠাৎ করে আশ্চর্য একটা প্রশান্তি এল তার ভেতর, কোনো কিছুতেই আর যন্ত্রণা হয় না। তার পঙ্গু দেহ যতবার একটা অপমানের গ্লানির ভেতর দিয়ে যায় ততবার ভেতরে ভেতরে সে উল্লাসে ফেটে পড়ে। আর কয়দিন তারপর দেখি কেমন করে এ জীবন আর তাকে যন্ত্রণা দেয়?

কাসেম সাবধানে বিছানা থেকে উঠল। জীবনের শেষ দিনের জন্যে সে অনেক কাজ জমা করে রেখেছে। আগে যত্ন করে শেভ করতে হবে। তারপর আলনা থেকে পরিষ্কার কাপড়। কোনোরকম করে খানিকটা পানি গরম করতে পারলে গোসল করে নিত সে, ডিসেম্বর মাসে যা শীত, ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করার কথা ভাবা যায় না।

কাপড় পরে আয়নার সামনে দাঁড়ালো কাসেম। যে মানুষের পা নেই সে যত যত্ন করেই কাপড় পরুক তাকে দেখতে কেমন যেন হাস্যকর দেখায়। এই পা নিয়ে গত এক বছরে তাকে কতই না অকারণ হৃদয়হীন মন্তব্য শুনতে হয়েছে।

কাসেম কাগজ কলম আর এক কাপ চা নিয়ে জানালার সামনে বসে। দার্জিলিং চা। অনেক কষ্ট করে জোগাড় করেছে আজকের দিনটির জন্য। চায়ের কাপে চুমুক দিতেই শরীরটা জুড়িয়ে যায়। কি চমৎকার সুঘ্রাণ। কাসেম আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরায়। বেন্সন এন্ড হেজেস—তার প্রিয় সিগারেট, বিশেষ বিশেষ দিনে সে একটা খায়। সামনে কাগজ রেখে সে কলমটা নিয়ে বসে। একা একা থাকে সে, তার মৃতদেহটার একটা ব্যবস্থা করার জন্যে একজন মানুষ দরকার। জয়নালকে সে জানিয়ে রেখেছে কাল ভোরে আসবে সে। জয়নাল খুব কাজের মানুষ। এক সাথে যুদ্ধ করেছে তারা। মোহনগঞ্জে মনোহরি দোকান জয়নালের। কাসেমের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটি অশিক্ষিত একজন দোকানী ব্যাপারটি কি বিচিত্র ? মনে হয় না, মৃত্যুর কাছাকাছি যখন দু'জন পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় তখন বাইরের সব খোলস ঝরে পড়ে ভেতরের সত্যিকার মানুষটা বের হয়ে যায়। সেই সত্যিকার মানুষ দু'জন যখন একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করে হাত বাড়িয়ে দেয় সেই বন্ধুত্ব কোনোদিন নষ্ট হয় না। জয়নালকে গুছিয়ে লিখতে হবে—বানান করে করে আস্তে চিঠিটা পড়বে, তাই লিখতে হবে গোটা গোটা করে। বেচারা খুব দুঃখ পাবে মনে হয়।

বাইরে আস্তে আস্তে প্রাত্যহিক জীবন শুরু হয়েছে। পাশের বাসায় ছোট মেয়েটা তার মায়ের সাথে ঝগড়া করছে। প্রতিদিনই করে। ভোরে নাস্তা করতে চায় না—শিশুটির কিছু একটা প্রিয় খাবার আছে কেন সেটা সে খেতে পারে না সেটা নিয়েই চিৎকার চেঁচামেচি। প্রায় দিনেই মেয়েটা রেগে মেগে ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের এই খোলা জায়গাটাতে এসে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে মেয়েটি। কয়দিন থেকে কাসেমকে নিয়ে কৌতূহল হয়েছে মেয়েটির, জানালার ভেতর দিয়ে কাসেমকে দেখতে চেষ্টা করে। পঙ্গু মানুষকে নিয়ে একটা শিশুর যেরকম কৌতূহল হয় আর কারো

সেরকম নয়। সবচেয়ে হৃদয়হীন ব্যাপারগুলো আসেও এই শিশুদের কাছ থেকে। ব্যাপারটার হয়তো কিছু একটা ব্যাখ্যা আছে কাসেম ঠিক জানে না।

কাগজটা ভাঁজ করে রেখে কাসেম জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। চিঠি লেখা শেষ হয়েছে তার। কেমন জানি একটা বিষাদ এসে ভর করছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা অনুভূতি। মৃত্যুর এতো কাছাকাছি এসে তার কী এখন দুঃখ হচ্ছে? কাসেম হাত বাড়িয়ে সোনারিলের শিশিটা টেনে নেয়, সাথে সাথে আশ্চর্য একটা উল্লাস অনুভব করে সে। জীবন! ভেবেছিলে তুমি আমাকে শুধু দুঃখ দেবে! দেখ তোমাকে আমি কেমন ফাঁকি দিই।

শিশি খুলে প্রথম ট্যাবলেটটা মুখে দিল সে। পানির গ্লাস থেকে এক ঢোক পানি খায়। একটা একটা করে খেলে হবে না। একসাথে অনেকগুলো করে খেতে হবে। কাসেম হাতে প্রায় সব ট্যাবলেট ঢেলে নেয়। মুখে দিয়ে চিবিয়ে খেতে হবে মুড়ির মত।

তোমার কি অনেক জ্বর উঠেছে? বাচ্চা একটা মেয়ের রিনরিনে গলার স্বরে ভীষণ চমকে ওঠে কাসেম। ছোট মেয়েটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কখন এসেছে মেয়েটি? কতক্ষণ থেকে তাকিয়ে আছে তার দিকে?

এত ওষুধ খাচ্ছ কেন? তোমার কী অনেক জ্বর উঠেছে? কাসেম ট্যাবলেটগুলো টেবিলে রাখলো। পর্দাটা টেনে দিতে হয়। জীবনের শেষ মুহূর্তে আর নতুন কোনো ঝামেলা চায় না সে। উঠে দাঁড়াতেই মেয়েটা বলল, তুমি মুক্তিবাহিনী। মা বলেছে আমাকে।

কাসেম থমকে দাঁড়ালো। কতদিন পরে কথাটি শুনলো।

মেয়েটি আরেকটু এগিয়ে আসে, তোমার পায়ে কি গুলি লেগেছিল? অনেক কি ব্যথা করেছিল?

কাসেম কোনো কথা না বলে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটা কাঁদো কাঁদো হয়ে যায় হঠাৎ, কথা বলো না কেন তুমি? কেন কথা বলো না?

কাসেম পর্দাটা টেনে দিল আর সাথে সাথে মেয়েটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতেই বাইরে থেকে বলল. তুমি এতো কেন খারাপ? মুক্তিবাহিনীরা কত ভাল হয়। তুমি কেন কথা বলো না? আমার আব্বুকেও তো মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে—তুমি কি সেই মিলিটারিকে মারো নাই? তাহলে কেন তুমি কথা বলো না—

বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়েটা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

কাসেম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেশ ছিল একটা শিশুর মতো। যাকে সে বুকে চেপে ধরে বলেছিল ভয় কি তোমার? আমি তো আছি। সেই দেশ যেন সত্যিই একটা শিশু হয়ে তার কাছে এসেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে তার একটা ভালোবাসার কোমল কথার জন্যে আকুল হয়ে কাঁদছে।

কাসেম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অভিমানিনী শিশুটার কান্না শুনতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি চলে যাচ্ছে। আহা, বেচারী!

কাসেম ক্রাচটা বগলে চেপে ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দরোজার দিকে এগিয়ে যায়। মেয়েটার সাথে তার কোমল স্বরে কয়টা কথা বলতে হবে।

দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে সে একবার টেবিলের দিকে তাকাল। তার সোনারিলের শিশি পড়ে আছে সেখানে। থাকুক পড়ে।

কাসেম দরোজা খুলে বের হয়ে যায়।

খুনী

খুব একটা বাজে রকমের গরম পড়েছে আজকে। ভ্যাপসা গুমোট একটা ভাব, মনে হচ্ছে পুরো শহরটাকে কেউ যেন অল্প আঁচে সেদ্ধ করছে। আমি জানালাটা খুলে দিতেই কয়েকটা মশা পিন পিন করে গান গাইতে গাইতে খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল, মনে হলো তারা জানালার বাইরে ঠিক এ জন্যেই অপেক্ষা করছিল। এরকম ভ্যাপসা গুমোট গরমে মশাদের কি আমাদের মতো কষ্ট হয়? মনে হয় না। ঘরে ফুল স্পীডে পাখা ঘুরছে, গরম ভ্যাপসা বাতাস শুধু উপর দিক থেকে নিচে নেমে আসছে কিন্তু এতোটুকু শীতলতা বয়ে আনতে পারছে না। ঘরে একশ ওয়াটের একটা উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে, সেটাকে ঘিরে নানারকম পোকা এসে ভিড় করছে। উজ্জ্বল আলোতে পোকাদের নিশ্চয়ই দৃষ্টি বিভ্রম হয়ে যায়। কারণ একটা ধূসর রংয়ের মথ বার বার বাল্বটাকে এসে আঘাত করছে, মনে হচ্ছে ভেতরের উত্তপ্ত ফিলামেন্টে আত্মাহুতি না দেয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না, এক মুহূর্তের বিরতির জন্যে দেয়ালে বসা মাত্রই একটা টিকটিকি খপ করে ধরে তাকে খেয়ে ফেলল। টিকটিকি দেখে কেউ বলতে পারে না সেটা পুরুষ না মাদী। কিন্তু এই টিকটিকিটা দেখে আমি বলতে পারছি এটা একটা মাদী টিকটিকি, তার স্বচ্ছ পাতলা চামড়া ভেদ করে একটা গোলাকৃতি ডিম উঁকি মারছে। এটা শুধু মাদী টিকটিকি নয় এটা গর্ভবতী মাদী টিকটিকি। কয়দিন এর খুব ভালো করে খেতে হবে। এইমাত্র একটি ধূসর মথ খপ করে গিলে ফেলেছে, এরকম আরো কিছু খাওয়া দরকার। এই টিকটিকিটা এখন একটি প্রাণী নয় এখন এটি দুটি প্রাণী। তার ভেতরের আরেকটা প্রাণ জন্ম নেবার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমার মনে পড়ল মাত্র কিছুদিন আগে রেহানা নামের একটি কমবয়সী বধূ এবং তার হতচকিত স্বামীকে ঠিক এরকম একটা কথা বলেছিলাম, শরীরের যত্ন নেবেন। মনে রাখবেন আপনি আর একজন মানুষ নন, এখন আপনি দুজন মানুষ।

রেহানা নামের সেই অল্পবয়সী বধূটি লজ্জায় লাল হয়ে মাথা নেড়েছিল, তার হতচকিত স্বামীকে কেমন জানি বিভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। কি বলবে বুঝতে না পেরে প্রায় ভাঙা গলায় বলল, সবকিছু ঠিক আছে তো, ডাক্তার সাহেব? সবকিছু?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।

কোনো অসুবিধে নেই?

না নেই।

কিছু যে খেতে পারে না। সবকিছুতে গন্ধ পায়—

সেটা খুবই স্বাভাবিক। শরীরে হরমোনের ব্যালেন্স অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম এরকম হয়।

কতদিন এরকম থাকবে?

সাধারণত প্রথম তিন মাস। কারো কিছু বেশি কারো কম। আমি তাদের সাহস দিয়ে বললাম, ঘাবড়ানোর কোনো ব্যাপার নেই। পৃথিবীতে এই একটা ব্যাপারে স্ট্যাটিস্টিক্স খুব বেশি। যত মানুষ তত স্ট্যাটিস্টিক্স! আমাদের সবার এভাবে জন্ম হয়েছে।

আমি তাদের বসিয়ে একটা লম্বা বক্তৃতা দিলাম। বহুবার দিয়েছি, বক্তৃতাটি দাড়ি কমা পর্যন্ত ঠিক করা আছে। পয়সাওয়ালা শিক্ষিত মানুষ হলে বক্তৃতাটি এক ধরনের হয়, অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষ হলে বক্তৃতাটি একটু ভিন্ন রকমের হয়, কিন্তু বিষয়বস্তু মোটামুটি এক। বক্তৃতাটি শুনে দুজন খুব খুশী হয়ে উঠে গিয়েছিল।

মধ্যরাতে ভ্যাপসা গুমোট গরমে টিকটিকিটিকে পোকা-মাকড়ের পিছনে ছোটাছুটি করতে দেখে আমার মনে পড়ল রেহানা নামের সেই সাদাসিধে বধূটি আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছিল। দিনে চার গ্লাস দুধ, মাছ, মাংস, শাক, সব্জি, পরিমিত পরিশ্রম কিছুতেই সে বাদ দেয়নি। কিন্তু পৃথিবীর এতো বড় স্ট্যাটিস্টিক্সের সমর্থন পেয়েও তার কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেল। রেহানা আর তার স্বামীর ভালোবাসার ফসল, ভ্রূণটি জরায়ুতে আশ্রয় না নিয়ে আশ্রয় নিল ফেলোপিয়ান টিউবে। সেই টিউব ফেটে ভ্রূণটি বের হয়ে এল, মেরে ফেলল তার জন্মদাত্রীকে। আমার কাছে যখন নিয়ে এসেছে তখন খুব দেরী হয়ে গেছে। সাদা কাপড়ে ঢেকে রেহানাকে যখন বের করে নিয়ে যাচ্ছিল তার কমবয়সী স্বামী ঠিক বুঝতে পারছিল না কী হচ্ছে। হাসপাতালের করিডোর থেকে ঘুরে তাকাল একবার আমার দিকে, চোখের দৃষ্টিতে সে কী ভয়াবহ শূন্যতা। আমি চোখ বুজলে এখনো দেখতে পাই।

মাথার ভেতর থেকে ঠেলে সবকিছু বের করে দিলাম। এই পৃথিবীতে দুটি বিষয় ছাড়া মানুষের মাঝে কোনো মিল নেই। একটি জন্ম আরেকটা মৃত্যু—কোথায় জানি এরকম একটা কবিতা পড়েছিলাম আমি। পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক ঘটনাকে বুকের মাঝে জিইয়ে রেখে লাভ কী?

আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালাম। কত রাত হয়েছে কে জানে। রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। একজন রিকশাওয়ালা একটা গান গাইতে গাইতে গেল, আহা, কি সুন্দর গলা! দুজন কমবয়সী তরুণ তর্ক করতে করতে যাচ্ছে, কি নিয়ে তর্ক করছে? প্রেম, সাহিত্য, না রাজনীতি? আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম, শুধু কথার উত্তাপটা শুনতে পেলাম কথাগুলো বুঝতে পারলাম না।

ঘরে একশো ওয়াটের বাল্বকে ঘিরে আরো পোকা জড়ো হয়েছে। মাদী গর্ভবতী টিকটিকিটাকে দেখা যাচ্ছে না, চলে গেছে মনে হয়। দুটি ছটফটে নূতন টিকটিকি এসেছে, মহাভোজ শুরু হয়েছে এদের।

ঘরের ভেতর এখনো ভ্যাপসা গরম, আমি আকাশের দিকে তাকালাম, মেঘ কি জমেছে আকাশে? এক পশলা বৃষ্টি কি নামবে? শীতল করে দেবে পৃথিবীটাকে?

মনে হয় না। আকাশ কালো হয়ে আছে, কিন্তু মেঘের জন্যে নয়। অন্ধকারের জন্যে, ধোঁয়া ধূলোবালি পৃথিবীর দূষিত নিঃশ্বাসের জন্যে। সারা পৃথিবী মনে হয় থমথম করছে আজ। নরক থেকে মনে হয় কিছু লোক বের হয়ে এসেছে শহরের নিচে তারা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, অল্প আঁচে সেদ্ধ করবে সব মানুষকে। আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে থাকি। বেঁচে থাকা কী এর থেকে আনন্দের হতে পারতো না?

আমার টুটুলের কথা মনে পড়ল। টুটুল আমার ছেলে, এতোদিনে সে নিশ্চয়ই তেরো বছরের কিশোর। তাকে কতকাল আমি দেখি না। আমার টুটুলের মা নারগিসের কথাও মনে পড়ল, আমার এককালীন স্ত্রী। কী সহজেই না সে আমাকে ছেড়ে আমার ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। কোথায় আছে সে এখন? কেমন আছে?

অসহ্য ভ্যাপসা গরমে খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আমি খানিকক্ষণ নারগিসের কথা ভাবি। আমার ছেলেকে এভাবে কেড়ে নেয়ার অধিকার কি তার আছে? আমার ছেলে! আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ।

একটা মশা গলার কাছে একটা রগের উপর বসে শক্ত করে কামড়ে ধরল, আমি হাত দিয়ে মারার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। পিন পিন শব্দে আনন্দে গান গাইতে গাইতে সেটি উড়ে গেল। এরপর কোথায় কামড়ে ধরবে ভেবে ঠিক করছে নিশ্চয়ই।

আমি ঘরের ভেতরে চলে এলাম। সারা ঘরে এক ধরনের অসুস্থ পরিবেশ। মাথার কাছে টেবিলে অ্যাশট্রেতে অসংখ্য সিগারেটের অবশিষ্ট। একটা আধ খাওয়া রুটির টুকরোকে ঘিরে পিঁপড়ার লম্বা সারি। অগোছালো বিছানা, মেঝেতে ছড়ানো পুরানো কাপড়। কিছু কাগজপত্র, কিছু বই, কিছু সোজা কিছু ওল্টানো খালি চায়ের কাপ আধখাওয়া চাপের কাপে বিষাক্ত ফাংগাস। দেয়ালে সস্তা ক্যালেন্ডার, মাকড়শার জাল। ক্যাটক্যাটে উজ্জ্বল আলোতে কী খারাপই না লাগছে সবকিছু দেখতে। আমি মশারি

তুলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। অগোছালো বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে বেড সুইচ টিপে দিতেই হতশ্রী ঘরটা অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্ধকারে চোখটা সয়ে আসতেই দূষিত অসুস্থ হতচ্ছাড়া ঘরটিকে কেমন যেন মায়াময় লাগতে থাকে। পৃথিবীর সব কদর্যতাকে ঢেকে ফেলার জন্যে অন্ধকার না থাকলে কী হত?

আমি ঘর্মাক্ত শরীরে ভ্যাপসা গরমে আমার মলিন বিছানায় শুয়ে থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকি মাথা থেকে সবকিছু সরিয়ে দিতে, কোন কিছু না ভাবতে। আমার জীবনে ভেবে আনন্দ পাবার মত আর কিছু নেই।

হঠাৎ করে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কেন ভাঙল জানি না, মনে হল কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটেছে এই ঘরে। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাকি, বুঝতে চেষ্টা করি কী হচ্ছে।

একজন মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই আমি। খুব ধীরে ধীরে সাবধানে নিঃশ্বাস ফেলছে একজন মানুষ। কে এই মানুষটি? আমি সাবধানে চোখ খুলে তাকালাম, খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার আলো এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে, তার হালকা আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ঐ তো মেঝেতে আমার পুরানো কাপড়, খালি চায়ের কাপ, ঐ তো অ্যাশট্রে, ঐ তো আধ খাওয়া রুটি। ঐ তো দেয়ালে সস্তা ক্যালেন্ডার। কিন্তু কোথায় সেই মানুষটি?

আমি বিছানাতে একটু নড়তেই অন্য কেউ নড়ে উঠল বিছানায়, প্রচণ্ড আতঙ্কে চিৎকার করতে গিয়ে থেমে গেলাম আমি। বুকের মাঝে ধক ধক করে শব্দ করছে হৃৎপিণ্ড, মনে হচ্ছে বুক ফেটে বের হয়ে আসবে হঠাৎ। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাকি, বুঝতে পারি আমার পাশে শুয়ে আছে আরেকজন। মাথা ঘুরিয়ে দেখার সাহস পাই না আমি, শক্ত হয়ে শুয়ে থাকি ঘর্মাক্ত শরীরে। কানের কাছে পিন পিন করছে একটা মশা, গলার রগে শুঁড় বসিয়ে শুষে নিতে থাকে রক্ত, তাড়ানোর সাহস হয় না আমার।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, আমার পাশে যে শুয়ে আছে সেও নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে, মনে হয় আমার মতই আতঙ্কে। আমি খুব সাবধানে মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম, সত্যিই আমার ঠিক পাশে একজন মানুষ শুয়ে আছে। কেমন করে এল এখানে? শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কে?

আমি।

আমি কে? জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল, হঠাৎ করে গলার স্বরটি আমি চিনতে পেরেছি। আতঙ্কে কুলকুল করে ঘামতে থাকি আমি।

মানুষটি বলল, লাইট জ্বালাই?

আমি শুষ্ক স্বরে বললাম, জ্বালাও।

মানুষটি হাত বাড়িয়ে বেড সুইচ টিপে লাইটটি জ্বালিয়ে দিতেই সারা ঘরটি একটি ক্যাটক্যাটে উজ্জ্বল আলোতে ভরে গেল, দেয়াল থেকে একটা কুৎসিত মাকড়সা ছুটে গেল অন্ধকারে, ঘরটি তার সমস্ত দূষিত রূপ নিয়ে আমার উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। উজ্জ্বল আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে সাবধানে তাকালাম মানুষটির দিকে। মানুষটিকে চিনতে পেরেছি আমি, মানুষটি আর কেউ নয়, আমি।

আমি নিজের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ময়লা একটা গেঞ্জি আর বিবর্ণ একটা লুঙ্গী পরে আছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কিছু কাঁচা কিছু পাকা, চেহারায় কেমন অসুস্থ একটা ভাব। চোখের নিচে কালি, মাথায় এলোমেলো চুল—কানের দু'পাশে পাক ধরেছে। আমার দিকে সেও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, আমি বুঝতে পারছি প্রচণ্ড আতঙ্কে চিৎকার করে ছুটে যাবার ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্ট করে থামানোর চেষ্টা করছে সে, ঠিক আমার মত। আমি আস্তে আস্তে বললাম, তুমি?

সে মাথা নাড়ল। বলল, হ্যাঁ। তারপর বালিশের নিচে হাত ঢুকিয়ে আমার সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরে ম্যাচটা খুঁজতে থাকে। আমি টেবিলের উপর থেকে ম্যাচটা তাকে দিই। সে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, আমি দেখতে পাই তার হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

আমি কোন উত্তর দিলাম না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে তাকিয়ে দেখতে থাকি। আমি অসংখ্য বার আয়নায় নিজেকে দেখেছি, কিন্তু এখন এভাবে নিজেকে দেখার সাথে তার কোন মিল নেই। আয়নায় দেখেছি নিজের ছবিকে—যেটি আমার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে। এখানে এই মানুষটি আমার ছবি নয়, এই মানুষটি আমি—আরেকজন আমি। সে আমাকে অনুকরণ করে না। বিছানায় আমার পাশে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। মানুষটি—যেটি আসলে আমি, আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

আমি বললাম, তুমি আমাকে সেটা জিজ্ঞেস করতে পার না।

কেন না?

কারণ আমিও তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করতে পারি। তুমি কোথা থেকে এসেছ?

কিন্তু আমি আসল।

না, তুমি আসল না।

তাহলে কি তুমি আসল?

আমি জানি না।

মানুষটি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি খুব দুঃখী মানুষ। তুমিও কি দুঃখী?

কেন একথা বলছ?

আমার মাঝে মাঝে টুটুলের কথা মনে হয়।

হ্যাঁ।

আমি যখন কাজ শেষ করে বাসায় আসতাম ছুটে আসত আমার কাছে, মনে আছে?

আছে। কাজ থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসতাম আমি।

হ্যাঁ। কিন্তু তোমার নিজের দোষে তুমি সবকিছু হারিয়েছ। সবকিছু।

আমি একটু উষ্ণ স্বরে বললাম, কেন তুমি একথা বলছ?

তুমি নার্গিসকে অবিশ্বাস করতে শুরু করলে। তুমি নার্গিসের গায়ে হাত তুললে। মনে আছে?

আমি হিংস্র দৃষ্টিতে মানুষটির দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি কেন আমাকে সেটা বলছ। আমিও তো তোমাকে সেটা বলতে পারি।

পার। মানুষটি বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বলল, আমি একটা পশু শ্রেণীর। আমার ভেতরে কোন কোমল অনুভূতি নেই।

আমরা দু'জন দীর্ঘ সময় বিছানায় বসে থাকি। সে সিগারেটটা শেষ করার পর আমি একটা সিগারেট ধরাই, তারপর অনেকক্ষণ দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকি। এক সময় আমি বলি, তুমি কেন এসেছ?

আমি?

হ্যাঁ।

নাকি তুমি?

যাই হোক। কেন?

তোমার সাথে সেই মেয়েটার দেখা তো হল না।

কোন্ মেয়েটার কথা বলছে বুঝতে পারলাম আমি তবু জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ মেয়েটার?

যার জন্যে তুমি রেহানার স্বামীকে মিথ্যা কথা বলে ফিরিয়ে দিলে। তোমার তাড়াহুড়া ছিল তাই তুমি রেহানার এত বড় বিপদটা বুঝেও বুঝলে না। ভান করলে তার পেটের ব্যথাটি তুচ্ছ কোন ব্যথা সাময়িক কোন ব্যথা।

কী বলছ তুমি? আমি হিংস্র গলায় বললাম, আমাকে কেন তুমি এসব বলছ?

কে বলল আমি তোমাকে বলছি? আমি নিজেকে বলছি। নিজেকে।

মানুষটি অপরাধীর মত মুখ করে বসে থাকে—আর তাকে দেখে আমার প্রচণ্ড আক্রোশে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। দাঁতে দাঁত ঘষে আমি বললাম, যাও তুমি এখান থেকে। চলে যাও—

কোথায় যাব?

যেখানে খুশী। জাহান্নামে—

মানুষটি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, যদি যেতে হয় তুমি যাবে। তুমি যাবে জাহান্নামে। শুধু যে রেহানার স্বামীর হাতে কয়টা পেন কিলার ধরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে তাই নয় পরদিন তাকেই তুমি দায়ী করলে সর্বনাশের জন্যে। বললে, আপনি নিজ হাতে মেরেছেন আপনার স্ত্রীকে। মনে আছে?

মনে আছে?

আমি চিৎকার করে বললাম, চুপ কর তুমি চুপ কর।

কেন চুপ করব? রেহানার স্বামী অবাক হয়ে তাকাল তোমার দিকে আর তোমার বুকের ভেতর নড়েচড়ে গেল আতংকে। মনে আছে? মনে আছে? নরঘাতক কোথাকার। প্রচণ্ড ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়ে যায় মানুষটির।

আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না, ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার উপর, মুখে আঘাত করে গলা টিপে ধরলাম প্রচণ্ড আক্রোশে। ধস্তাধস্তি করে আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মানুষটি। মশারি ছিঁড়ে বিছানা থেকে নিচে এসে আছড়ে পড়ল। কপালের পাশে কেটে গেছে, দরদর করে রক্ত ঝরছে গাল বেয়ে। লুঙ্গী খুলে গিয়েছিল মানুষটির, আবার কোমরে গিট মেরে সোজা হয়ে দাঁড়াল মানুষটি। তারপর আমার দিকে তাকাল স্থির চোখে। ধক ধক করে জ্বলছে সেই চোখ। আমার চোখ।

আমি আমার চোখে মৃত্যু দর্শন করলাম।

জঞ্জাল

আমার বাসাটির নাম জনসন হাউজ। শুধু নামেই বাসা আসলে এটি একটি পুরাতন গুদাম ঘরের মত। বাসার যিনি মালিক তিনি বাসার প্রতি বর্গইঞ্চি ব্যবহার করে অসংখ্য ছোট ছোট খুপড়িতে ভাগ করে নিয়েছেন। একেকটা খুপড়ি এককজনের কাছে ভাড়া দেয়া হয়, ভাড়া নেয় আমার মত দরিদ্র ছাত্রেরা। পুরাতন, অন্ধকার, মলিন ঘর, আমরা যারা থাকি পয়সা বাঁচানোর জন্যেই থাকি। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু ঘরের ভাড়া উনষাট ডলার। এক ডলার বাড়িয়ে এটাকে ষাট ডলার কেন করে দেয়া হল না সেটি এখনো আমার কাছে রহস্য! উনষাট ডলারের সেই খুপড়ি মনুষ্য বাসের উপযোগী নয়, আসবাব বলতে একটি ছোট বিছানা, একটি ময়লা ডেস্ক এবং রং ওঠা একটি চেয়ার। সারাদিন ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করে, লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে গভীর রাতে ফিরে এসে মড়ার মত ঘুমাই, কাজেই উনষাট ডলারের সেই খুপড়িতে আমার বেশ চলে যাচ্ছিল। অসুবিধে যে হয় না তা নয়, বাথরুম এবং রান্নাঘর বারোয়ারি, সময় মত ব্যবহার করার জন্যে লাইন না দিলে হাতছাড়া হয়ে যায়। সস্তা ঘর বলে ছাত্র ছাড়াও আরো কিছু চালচুলোহীন মানুষ থাকে। তাদের কেউ কেউ পাকাপাকিভাবে রান্নাঘরে বসে সস্তা মদ খেতে থাকে। প্রথম দিকে বেশ হাসিখুশি থাকে কয়েক বোতল খাওয়ার পর তাদের মেজাজি মর্জি পাল্টে যায়। বাসার ম্যানেজার সাতফুট উঁচু তিনশ পাউন্ড ওজনের একজন দানব বিশেষ, কেউ কোন গোলমাল করার সাহস পায় না। কিন্তু সব মিলিয়ে বাসাটিতে এক ধরনের দূষিত পরিবেশ। সামনের ক্রীসমাসের ছুটিতেই এখান থেকে সরে মোটামুটি একটা ভদ্র এলাকায় চলে যাব বলে ঠিক করেছি।

একদিন রাতে ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে এসেছি, ঘুমানোর আগে এক কাপ চা খাবার ইচ্ছে হল। রান্নাঘরটি বাসার বেসমেন্টে অনেক ঘুরে যেতে হয়। রান্নাঘরের কাছাকাছি

আসতেই একটা হল্লা শুনতে পেলাম, মনে হল খুব আনন্দের কিছু ঘটছে। মধ্য রাতে মদ্যপ কিছু মানুষের আনন্দ সুখের ব্যাপার নাও হতে পারে। ভয়ে ভয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখি ভারতীয় চেহারার বুড়ো একজন মানুষ পাংশু মুখে খাবার টেবিলে বসে আছে, সামনে একটা পাউরুটি। তাকে ঘিরে বসে আছে এই বাসার উচ্ছৃঙ্খল ছেলেগুলো। একজনের হাতে একটা বিয়ারের বোতল, চেষ্টা করছে বুড়ো মানুষটিকে এক ঢোক খাইয়ে দিতে। আমাকে দেখে তাদের উল্লাস একটু ভাটা পড়ল, আমি নিজের ভয়টাকে ঢেকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হচ্ছে ওখানে?

পার্টি। ওয়াইল্ড পার্টি।

তরুণগুলো আমাকে উপেক্ষা করে আবার সেই বৃদ্ধকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একজন তার ঘাড় ধরে মুখটা হাঁ করিয়ে রাখে অন্য জন তার মুখে বিয়ার ঢালতে চেষ্টা করে। ব্যাপারটির অমানুষিকতা সহ্য করার মত নয়। আমার কপালে বড় দুঃখ হতে পারে জেনেও আমি গলা উঁচিয়ে বললাম, ছেড়ে দাও তোমরা ওকে। ছেড়ে দাও।

একজন চোখ লাল করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কোথাকার লাট সাহেব আমাদের মজা নষ্ট করতে এসেছ? তারপর আমার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা সংক্রান্ত কিছু কুৎসিত গালিগালাজ করে দিল।

মাতাল মানুষের চরিত্র নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব কম কিন্তু মধ্যরাতে একাধিক মদ্যপ তরুণের সাথে ঝগড়া বিবাদ শুরু করার ফল যে শুভ নাও হতে পারে সেটি বুঝতে আমার এতটুকু দেরি হল না।

আমি আমার ভয় গোপন করে চিৎকার করে বললাম, এক্ষুণি ছেড়ে দাও ওকে, না হয় আমি পুলিশ ডাকব। তোমরা পেয়েছটা কি? এটা কী মগের মুল্লুক নাকি?

আমার চিৎকার আর চেঁচামেচির জন্যেই কিনা জানি না তারা বৃদ্ধটিকে ছেড়ে দিল। আমার দিকে তাকিয়ে কিছু কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে বলল, তোমার চোদ্দগুষ্ঠীকে আমি ইয়ে করি।

আমি বুক টান করে বললাম, দূর হও এক্ষুণি, না হয় আমি ম্যানেজারকে ডাকছি। পুলিশের ভয় দেখিয়ে যে কাজটি করা যায়নি, ম্যানেজারের ভয় দেখিয়ে সেটা করা গেল। সত্যি সত্যি পুলিশকে খবর দেয়া হলে পুলিশ এসে বড় জোর খানিকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে একটু শাসিয়ে যাবে। ম্যানেজারের বেলা ভিন্ন কথা, তাকে খবর দেয়া হলে সে কারো কোন কথা না শুনে এই উচ্ছৃংখল মদ্যপ তরুণগুলোকে এমনভাবে রগড়ে দেবে যে দীর্ঘদিনের জন্যে তারা সিধে হয়ে থাকবে। ম্যানেজারের গায়ের রং কুচকুচে কাল হতে পারে, তার আকার আকৃতি দানবের মত হতে পারে কিন্তু তার মনটি শিশুর মত কোমল। গান্ধী ছায়াছবি দেখার পর থেকে তার ধারণা পাক-ভারত উপমহাদেশের আমরা সবাই একটি ছোটখাট গান্ধী এবং আমাদের রক্ষা করার জন্যে সে প্রয়োজনে নিজের জানও দিয়ে দিতে রাজি আছে!

ছেলেগুলো বিদায় নেয়ার পর আমি ভারতবর্ষীয় এই বৃদ্ধ লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? এখানে কী করছেন?

বৃদ্ধ লোকটি বাংলাদেশের স্কুল মাস্টারের ইংরেজি উচ্চারণে বললেন, আমার নাম শওকত আলী। আমি এখানে একটা ঘর ভাড়া করে থাকব। ভদ্রলোক তখনো ভয়ে একটু একটু কাঁপছেন।

আপনি কোন দেশের?

বাংলাদেশের। আপনি?

আমি উৎফুল্ল হবার ভান করে বললাম, আমিও বাংলাদেশের! কী যোগাযোগ!

এবারে আমরা বাংলায় কথা বলতে শুরু করলাম। সামনের চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলাম, এত জায়গা থাকতে জনসন হাউজে এলেন কী মনে করে?

ইউনিভার্সিটিতে কাজ পেয়েছি একটা, এটা ইউনির্ভাসিটির কাছে তাই এসেছি। এই অবস্থা কে জানত—

কী কাজ?

কাফেটোরিয়াতে বাসন পাতি ধোয়া।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই বৃদ্ধটির দিকে তাকালাম। কমবয়সী তরুণেরা নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্যে আমেরিকা পাড়ি দিয়ে বাসনপত্র ধোয়াধুয়ি করছে, ট্যাক্সি চালাচ্ছে ব্যাপারটা বুঝতে পারি, কিন্তু এই বয়সের একজন মানুষ জনসন হাউজের মত একটি বাসায় একটা ছোট খুপড়ি ভাড়া করে কাফেটোরিয়াতে বাসন ধুচ্ছেন, ব্যাপারটা কেমন যেন গ্রহণ করা যায় না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কবে এসেছেন আপনি?

আমি?

হ্যাঁ।

অনেকদিন হল। শওকত সাহেব আংগুলে গুনে বললেন, নয় বছর।

নয় বছর?

হ্যাঁ।

এর আগে কোথায় ছিলেন?

শওকত সাহেব একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, ছেলের কাছে।

ছেলের কাছে? আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনার ছেলে এখানে আছে?

হ্যাঁ। আমার চার ছেলে তিন মেয়ে। একটা মেয়ের দেশে বিয়ে হয়েছে, সে দেশে আছে। আর সবাই এখানে।

কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কৌতূহল দেখানো ঠিক নয় কিন্তু আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, এই বয়সে আপনি এখানে পড়ে আছেন কেন? ছেলেদের সাথে থাকেন না কেন?

ভদ্রলোক কেমন জানি আহত একটা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবা, এই দেশের তো এটাই নিয়ম। সবাই নিজের পায়ে দাঁড়ায়। শুধু শুধু ঘরে বসে না থেকে একটু কাজকর্ম করে নিজেকে ব্যস্ত রাখি আর কি! একটু থেমে যোগ করলেন, যদি ভাল না লাগে ছেলের কাছে চলে যাব।

ভাল লাগা না লাগার কি আছে, চলে যান ছেলের কাছে! এটা একটা থাকা হল! আমরা কমবয়সী বলে পারি, আপনি কেমন করে পারবেন?

তা ঠিক। ভদ্রলোক দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, তা ঠিক।

এরপর শওকত সাহেবের সাথে প্রায়ই দেখা হতে লাগল। খুব ভোরে উঠে রান্নাঘরে কেউ আসার আগে নাস্তা করে নিতেন। রুটি, টোস্ট, মাখন এবং ডিম। এই বয়সে প্রতিদিন সকালে দুটো করে ডিম খাওয়া যে তার জন্যে ভাল নয় ব্যাপারটা তাকে ঠিক বোঝাতে পারলাম না। সম্ভবত মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়েছেন, ধরে নিয়েছেন দুধ মাখন ডিম হচ্ছে বড়লোকের ভাল খাবার। যৌবনে যেটা খেতে পাননি এখন সেটা পুষিয়ে নিচ্ছেন। নাস্তা করে নীল রংয়ের একটা পার্কা পরে তিনি কাজে যেতেন, এক হাতে সবসময় একটা ছাতা অন্য হাতে দুপুরের খাবার। সারাদিন কাজ করে বিকালে ফিরে আসতেন। রাতের খাবার রান্না করে নিজের রুমে নিয়ে যেতেন, সম্ভবত অন্য সবার সামনে হাত দিয়ে খেতে তার লজ্জা লাগত।

শনি রবিবার ছুটির দিন, আমি বেলা করে ঘুমাই। ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করতে বাইরে যাচ্ছিলাম দেখি শওকত সাহেব জনসন হাউজের সামনে হাঁটাহাঁটি করছেন। পরনে পরিষ্কার জামা কাপড় এবং গলায় একটা টাই। এক হাতে চকলেটের একটা বাক্স। আমাকে দেখে একটু লাজুক ভঙ্গিতে বললেন, উইক এন্ডে ছেলের বাসায় যাবার কথা। এসে নিয়ে যাবে। নাতিটার জন্যে একটা চকলেটের বাক্স কিনলাম। এক টুকরা চকলেট খেতে পেলে আর কিছু চায় না!

আমি বললাম, বেশ, ভাল। উইক এন্ডে যদি সবাইকে নিয়ে একটু হৈ চৈ না করেন কেমন করে হবে! কখন ফিরে আসবেন?

দেখি। কাল রাতের মাঝে আসতে হবে। ভোর বেলা তো আবার কাজ!

নাস্তা করে আড্ডা মেরে ফিরে আসতে আসতে বেলা একটা বেজে গেছে, দেখি তখনো বাইরে শওকত সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে দুর্বলভাবে একটু হাসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল গেলেন না?

ইয়ে, মানে—ছেলে এখনো আসেনি তো, তাই অপেক্ষা করছি। খুব ব্যস্ত মানুষ। উইক এন্ডে তো কথাই নেই! নাতিটা কারাটে স্কুলে যায়, নাতনিটা ব্যালে ক্লাসে!

সবাইকে নামিয়ে আসতে আসতে মনে হয় দেরি হয়ে যায়।

আমি বিকেল চারটার সময় জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম শওকত সাহেব তখনো সেজেগুজে বাইরে অপেক্ষা করছেন। তখনো তার ছেলের বৃদ্ধ বাবাকে তুলে নিয়ে যাবার সময় হয়নি।

ছুটির দিনে প্রায়ই এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। শওকত সাহেব সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছেন তার ছেলে এসে তাকে নিয়ে যাবে, কিন্তু তার ছেলের দেখা নেই। কেমন ধরনের ছেলে আমি ভেবে পেতাম না। আমি কখনো সোজাসুজি জিজ্ঞেস করি নি। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এই বৃদ্ধ মানুষটিকে দেশ থেকে জোর করে ধরে নিয়ে এসে আমেরিকার নাগরিকত্ব দিয়ে দেয়া হয়েছে তার অন্য ছেলেদের আনার জন্যে। ছেলেরা পাকাপাকিভাবে আসন গেড়ে নেবার পর হঠাৎ করে আবিষ্কার বাবা একটি বাড়তি যন্ত্রণার মত। এক ছেলে অন্য ছেলের ঘাড়ে গছিয়ে দেবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত তার গতি হয়েছে জনসন হাউজের এই দূষিত খুপড়িতে!

আমার ভদ্রলোকের জন্যে একটু মায়া হতো সত্যি কিন্তু তার জন্যে কিছু করতে পারতাম না। নিজের কাজে ব্যস্ত থাকি অন্যদের সাথে কথা বলার সময় নেই। সময় থাকলেও বন্ধুদের সাথে হৈ চৈ করে আড্ডা মারি। এই বৃদ্ধ মানুষের সাথে কথা বলার সময় কোথায়? নিজের ছেলে যদি তার বাবার দায়িত্ব নিতে না পারে আমি কেমন করে নেব?

একদিন শওকত সাহেব খুব উৎসাহ নিয়ে আমার ঘরে এসে হাজির হলেন, জিজ্ঞেস করলেন, এই শনিবারে কী করছ?

এখনো ঠিক করিনি। কেন?

আমার নাতির জন্মদিন, আমার ছেলে তোমাকে যেতে বলেছে।

সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মানুষের ছেলের জন্মদিনে যাবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই কিন্তু কথাটা সোজাসুজি শওকত সাহেবকে বলতে পারলাম না। বললাম, দেখি কী রকম প্রোগ্রাম হয়।

শওকত সাহেব বললেন, না না কোন প্রোগ্রাম রাখবে না। আমার সাথে যাবে তুমি।

শওকত সাহেবের প্রবল উৎসাহে সত্যি সত্যি পরের শনিবার আমি চকলেটের একটা বাক্স নিয়ে তার ছেলের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। শহরের সম্ভ্রান্ত এলাকায় বিরাট এলাকা নিয়ে চমৎকার দোতলা বাসা। ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে স্থানীয় বাঙালিরা এসেছে, খাবারের বিশাল আয়োজন। আমি ইউনিভার্সিটির ছাত্র, এখানে যারা এসেছে তাদের সবাই মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত। কারো সাথে আমার পরিচয় নেই। ভেবেছিলাম সন্ধেটা পুরোপুরি মাটি হবে, কিন্তু লোকজনের সাথে পরিচয় হওয়ার পর সময়টা বেশ

ভালই কাটল। শওকত সাহেবের দুই ছেলে এবং তাদের স্ত্রীদের সাথে পরিচয় হল। তৃতীয় ছেলেটি আমেরিকান বিয়ে করেছে বলে এরকম জায়গায় আসে না। আমি ভেবেছিলাম এই বৃদ্ধ মানুষটিকে এভাবে জনসন হাউজে ফেলে না রেখে নিজেদের বাসায় নিয়ে রাখার কথা বলব, কিন্তু তার সুযোগ হল না। চারদিকে এত হৈ চৈ আনন্দ, তার মাঝে এ ধরনের কথাবার্তা মনে হয় একেবারে খাপ খায় না। আমি শওকত সাহেবের দুই ছেলের টেলিফোন নাম্বার নিয়ে এলাম, ফোনে কথা বলব কোন একদিন।

শরৎকাল পর্যন্ত শওকত সাহেব ভালই ছিলেন, শীতের শুরুতে তার শরীর খারাপ হয়ে গেল। এদেশে শীতকালটি বড় বাজে সময়। ভোর আটটা বেজে গেলেও সূর্য ওঠে না আবার বিকেল চারটার মাঝে অন্ধকার নেমে আসে। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, বৃষ্টি ভেজা প্যাচপ্যাচে কাদা সব মিলিয়ে মন খারাপ করা একরকমের আবহাওয়া। জনসন হাউজে ঘর গরম রাখার ভাল ব্যবস্থা নেই, শওকত সাহেবের বুকে কাশি বসে গেল। কাজ কামাই করে তিনি কয়দিন ঘরে বসে থাকলেন। আমি একদিন শওকত সাহেবের ছেলের বাসায় ফোন করলাম, ছেলে ছিলেন না তার স্ত্রী ফোন ধরলেন। নিজের পরিচয় দিতেই ভদ্রমহিলা একটু শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

শওকত সাহেবের শরীর খারাপ।

কি হয়েছে?

ঠাণ্ডা লেগেছে, জ্বর কাশি। আমার মনে হয় তাকে আপনারা এখন আপনাদের বাসায় নিয়ে যান। এখানে থাকলে খুব কষ্ট হবে।

ভদ্রমহিলা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আপনাকে আমার ভাশুরের টেলিফোন নাম্বার দিই, আপনি তাকে ফোন করে বলেন।

কী বলব?

শ্বশুরকে তার বাসায় নিয়ে যাবার জন্যে।

আমি উষ্ণ হয়ে বললাম, আমি কেন বলব? বুড়ো একজন মানুষ কষ্ট পাচ্ছে শীতের মাঝে, ছেলেরা এত ভাল বাসায় থাকে আর বুড়ো বাবাকে নিয়ে নিজের বাসায় রাখতে পারবে না? এটা কোন ধরনের কথা?

অন্য পাশ থেকে ভদ্রমহিলাও উষ্ণ হয়ে উঠে বললেন, দোষ শুধু আমাদের? কতদিন নিজের ঘাড়ে টেনেছি আপনি জানেন? আমার সাহেবই শুধু ছেলে? অন্যেরা তার ছেলে না? দরকারে অদরকারে শুধু আমাদের খোঁজ পড়ে? অন্যেরা আছে কী জন্যে?

আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার আপনারা বোঝেন, একজন বুড়ো মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন নিজের ছেলেরা দেখছে না জিনিসটা ভাল দেখায় না, তাই বললাম। যা ইচ্ছে হয় করেন।

আমি রেগে মেগে টেলিফোন রেখে দিলাম।

সন্ধেবেলা শওকত সাহেবকে দেখতে গেলাম। কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় পা তুলে বসে আছেন। ঘরের মাঝামাঝি ছোট একটা ইলেকট্রিক হিটার ঘরটাকে গরম করার চেষ্টা করছে। আমাকে দেখে দুর্বলভাবে হেসে বললেন, এই ঠাণ্ডাটা বড় কাহিল করে দিয়েছে।

হ্যাঁ। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে এবার। আপনার শরীর কেমন?

এই বয়সে আর শরীর। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে কাটিয়ে দিই আর কয়টা দিন।

ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন?

না যাইনি।

আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে?

ইন্স্যুরেন্স? মনে হয় আছে। মেজো ছেলেটা সেদিন নিয়ে গিয়ে করিয়ে দিল।

সেদিন করিয়ে দিল মানে? আগে অসুখ বিসুখ হলে কী করতেন?

শওকত সাহেবকে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল। আমি কথা বলে বুঝতে পারলাম তার আলাদা করে কোন রকম হেলথ ইন্স্যুরেন্স নেই। এদেশের বুড়ো মানুষদের জন্যে সরকার থেকে দায়সারা যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে সেটাই একমাত্র অবলম্বন। মেজো ছেলেটি তাকে নিয়ে যে ইন্স্যুরেন্স কিনে দিয়েছে সেটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স। শওকত সাহেব মারা গেলে মেজো ছেলে মোটা অংকের টাকা পাবেন। বুড়ো মানুষ মারা তো যাবেনই তাকে বিক্রি করে কিছু বাড়তি টাকা পেলে মন্দ কী? ব্যাপারটা ভেবে আমার কেমন জানি গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে।

শওকত সাহেবের সাথে আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। ভদ্রলোকের মনটা নিশ্চয়ই দুর্বল হয়েছিল। ঘুরে ফিরে শুধু তার মৃত স্ত্রীর কথা বললেন। হৃদয়হীন এই পৃথিবীতে স্ত্রীর স্মৃতি ছাড়া ভালবাসার আর কিছু তার জন্যে অবিশিষ্ট নেই।

শওকত সাহেব এক সপ্তাহ পরে মারা গেলেন। রাতে কাজ থেকে ফিরে এসে ম্যানেজারের কাছে শুনলাম দুপুরে তার ঘর থেকে গোঁ গোঁ ধরনের একটা শব্দ হচ্ছিল। দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হল। ভেতরে তিনি বিছানায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন, মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স ডেকে সাথে সাথে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। ম্যানেজারের কাছে তার ছেলের টেলিফোন নাম্বার ছিল তাদেরকে খবর দেয়া হয়েছে। তার ঠিক কী হয়েছিল এখনো জানা যায়নি, সন্দেহ করা হচ্ছে স্টোক বা হার্ট অ্যাটাক জাতীয় কিছু হয়েছে।

হাসপাতালে যেতে আমার একেবারেই ভাল লাগে না। আমি তবু শওকত সাহেবকে দেখতে গিয়েছিলাম। ভিজিটরদের সময় পার হয়ে গিয়েছিল তবু আমাকে যেতে দিল। হাসপাতালের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। নাকে একটি নল লাগানো।

নিশ্চয়ই অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। হাতে পায়ে নানা ধরনের ওষুধপত্র যাচ্ছে। শওকত সাহেবের জ্ঞান নেই। তাকে ঘিরে তার তিন ছেলে এবং ছেলেদের স্ত্রী। আমার সাথে কিছু কথাবার্তা হল। শওকত সাহেবকে দেখে শুনে রাখার জন্যে তারা আমাকে নানাভাবে ধন্যবাদ দিলেন। আমি কিছুক্ষণ থেকে ফিরে এসেছিলাম, সকালে খবর পেয়েছি রাতেই মারা গেছেন।

শওকত সাহেবের চেহলামে আমাকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম যাব না, শেষ পর্যন্ত কি মনে করে গিয়ে হাজির হলাম। বাসা ভরা লোকজন, শোকের চিহ্নটি খুব স্পষ্ট নয়। একজন মৌলভী গোছের মানুষ ধরে নিয়ে আসা হয়েছে, তিনি এক কোণায় বসে কোরান শরীফ পড়ছেন। খাওয়া দাওয়ার আগে মিলাদ পড়ানো হল। মৌলভী গোছের মানুষটি উর্দু আরবি মিশিয়ে অনেক ভাল ভাল কথা বললেন। একটি কথা এরকম: শওকত সাহেবের মত সৌভাগ্যবান মানুষ খুব বেশি নেই, তার মৃত্যুর পর তার আত্মার মাগফেরাতের জন্যে যে পরিমাণ দোয়া খায়েরের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আমেরিকা দূরে থাকুক, বাংলাদেশেও আজকাল কোন মানুষ তাদের বাবা মায়ের জন্যে সেই পরিমাণ দোয়া খায়ের করতে চায় না। শুধু যে ছেলেরা তার আত্মার জন্যে দোয়া খায়ের করছে তাই নয়, তাদের স্ত্রীরাও করছে। চেহলাম উপলক্ষ্যে খতমে ইউনুস শেষ করা হয়েছে এবং শওকত সাহেবের দুই পুত্রবধূ একলক্ষ বার দোয়া ইউনুস পড়ে ফেলেছেন। মৌলভী সাহেবের মতে এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা।

মিলাদ চলাকালীন ঘরের এক কোণায় একটি ভিডিও ক্যামেরায় পুরো ব্যাপারটি ধরে রাখা হচ্ছিল। কোথায় জানি শুনেছিলাম লাইফ ইন্স্যুরেন্সের টাকা তোলার সময় মৃত মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটা প্রমাণ দেখাতে হয়।

শোভন

শোভন যখন আমার বাসায় এসেছে তখন রাত একটা। আমি তাকে আগে কখনো দেখি নি। কার কাছে আমার খোঁজ পেয়েছে তাও জানি না। রাত একটার সময় দরজা খুলে দেখি কমবয়সী একটা ছেলে হাতে একটা স্যুটকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিছনে পাহাড়ের মত বড় একজন আমেরিকান। কমবয়সী ছেলেটি, যার নাম শোভন, মুখ কাচুমাচু করে বলল, আপনি বাংলাদেশের?

হ্যাঁ।

বড় বিপদে পড়েছি, আপনার বাসায় থাকতে দেবেন আজ রাতটা?

কি বিপদ জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু তার আগেই শোভন ভেতরে ঢুকে স্যুটকেসটা রেখে দিয়েছে। পাহাড়ের মতন আমেরিকানটি শোভনকে আমার কাছে গছিয়ে দিয়ে কিছু বলার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

শোভন সোফায় বসে জ্যাকেট খুলে আমার দিকে তাকিয়ে অমায়িকভাবে হেসে বলল, ইশ, আপনি না থাকলে যে কী অবস্থা হত!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কী নাম? কোথা থেকে এসেছেন?

আমাকে আপনি তুমি করে বলবেন, প্লীজ।

তোমার নাম কী?

শোভন। জার্মানি থেকে এসেছি।

দেশ স্বাধীন হবার পর বেশ কিছু কমবয়সী তরুণ জার্মানি পাড়ি দিয়েছিল। তাদের বেশির ভাগই ছোটখাট কাজ করে সময় কাটিয়েছে। কেউ কেউ কিছু অর্থ সঞ্চয় করে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে আমেরিকা আসতে শুরু করেছে। শোভন সেই দলের একজন। আমেরিকা সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, ওয়াশিংটন ডি.সি. শহরে যাবার পরিকল্পনা ছিল ভুল করে ওয়াশিংটন স্টেটে চলে এসেছে। এই ধরনের ব্যাপার যে

ঘটতে পারে নিজের চোখে না দেখলে আমি কখনো বিশ্বাস করতাম না। ওয়াশিংটন স্টেট এবং ওয়াশিংটন ডি. সি-র মাঝে দূরত্ব কম পক্ষে চার হাজার মাইল!

সে রাতে শোভনের সাথে বেশি কথা হল না, ভোরে উঠে আমাকে কাজে যেতে হবে কাজেই বাইরে সোফায় শোভনকে একটা বিছানা করে দিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরে আমি যখন কাজে গিয়েছি তখনও শোভন সোফায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ছোট অ্যাপার্টমেন্ট, রান্নাঘরে আমি নাস্তা করলাম, কফি তৈরি করে খেলাম, শোভনের ঘুমের কোন অসুবিধা হল না।

সন্ধেবেলা বাসায় ফিরে এসে দেখি শোভন রান্না করে রেখেছে। ভাত, মুরগির মাংস, সবজি এবং ডাল। সাথে সালাদ। শুধু যে রান্না করে রেখেছে তাই নয়, খাবার টেবিলে সেই খাবার সাজিয়ে রেখেছে। বাটিতে ভাত, মাংস, সবজি গ্লাসে পানি। ধোয়া প্লেট, প্লেটের পাশে ন্যাপকিন। কেমন জানি হোটেল হোটেল ভাব। আমি একটু বিব্রত হয়ে বললাম, আরে তুমি কী করেছ এসব?

শোভন এক গাল হেসে বলল, কোন অসুবিধে নেই। রান্না করতে আমার ভাল লাগে।

তাই বলে দুদিনের জন্যে এসে তুমি রান্না করে রাখবে?

হেঃ হেঃ হেঃ, কি আছে তাতে।

খেতে বসে আবিষ্কার করলাম শোভন পাকা রাঁধুনী। আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি এত সুন্দর রান্না করতে শিখলে কোথায়?

জার্মানিতে হোটেলে বাবুর্চির কাজ করতাম। ভাল লেগেছে রান্না?

লাগে নি মানে? তুমি তো গুণী মানুষ!

আমার প্রশংসা শুনে শোভন লাজুকভাবে হাসে।

এক রাতের জন্যে এসেছিল কিন্তু দুই সপ্তাহ সে আমার এখানে কাটিয়ে দিল।

আমি নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করি, কিন্তু শোভন আসার পর থেকে আমার নিরিবিলি থাকা শিকেয় উঠেছে।

শোভন রান্না করে রাখে, ঘর দোর গুছিয়ে রাখে, বাজার করে আনে এমন কী একদিন আমার ময়লা কাপড় লন্ড্রী করে রাখল। তার আচার আচরণে এক ধরনের ভৃত্য ভৃত্য ভাব রয়েছে যেটা আমাকে খুব অস্বস্তির মাঝে ফেলে দেয়। আমি বাধ্য হয়ে একদিন তার সাথে এই নিয়ে কথা বললাম। জিজ্ঞেস করলাম, শোভন, তোমার পরিকল্পনাটা কী? কী করছ? কোথায় থাকবে?

শোভন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, না মানে আমি ভাবছিলাম আর কয়টা দিন দেখি। আপনার কী খুব কষ্ট হচ্ছে?

না কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু এভাবে তো সারা জীবন থাকতে পারবে না। কিছু একটা ব্যবস্থা কর।

জ্বী করব। কাল থেকে শুরু করব।

কি শুরু করবে?

কাজ খোঁজা শুরু করব।

তোমার কি কাজ করার কাগজপত্র আছে?

শোভন মাথা চুলকে বলল, এখন নাই, কিন্তু ছোটখাট কাজ কী আর পাওয়া যাবে না?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, সেটা আমি বলতে পারব না।

পরের দিন ভোর থেকে শোভন কাজ খুঁজতে বের হল। ভাল কাপড় পরে বের হতে চাইছিল তাই আমার কাছ থেকে একটা শার্ট চেয়ে নিল। ছেলেটার আচার আচরণে একটা সারল্য রয়েছে যেটা আমার নির্বুদ্ধিতার কাছাকাছি বলে সন্দেহ হতে থাকে।

কাজ খুঁজতে গিয়ে শোভনের খুব বেশি লাভ হল না, হবে আমি সেরকম আশা করি নি কিন্তু অন্য একটি ব্যাপার ঘটে গেল। শোভনের এই গুণের কথা আমি তখনো জানি না। কি কাজে দুপুর বেলা বাসায় এসেছি দেখি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ চাবি দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুকে থ হয়ে গেলাম। আমার বিছানায় জড়াজড়ি করে বিবস্ত্রা একটি মেয়েকে নিয়ে শুয়ে আছে শোভন। আমি হঠাৎ করে এসেছি সামলে নেবার সময় পায়নি।

আমি হতবাক হয়ে বের হয়ে এলাম। জামাকাপড় পরে প্রথমে শোভন তারপর সেই মেয়ে বের হয়ে এল। এরকম একটা পরিবেশে ঠিক কী করতে হয় আমার জানা নেই। তাই ভাব দেখাতে হল যেন এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। মেয়েটির সাথে শোভন পরিচয় করিয়ে দিল, কমবয়সী খুব আকর্ষণীয় চেহারার মেয়ে, আমি অবাক হয়ে গেলাম শোভন এত অল্প সময়ে কেমন করে এই মেয়েটিকে খুঁজে বের করেছে?

রাত্রি বেলা খাওয়ার পর আমি বললাম, শোভন, আমার মনে হয় এখন তোমার নিজের একটা বাসা নেয়ার সময় হয়েছে।

শোভন লাল হয়ে বলল, আর কোনদিন করব না, জাফর ভাই।

করা না করার কোন কথাতো হচ্ছে না। তুমি তো আর সারা জীবন আমার কাছে থাকতে পারবে না।

আমার দোষ নাই, জাফর ভাই। সিনথিয়া একেবারে পাগল হয়ে গেল। এই দেশের মেয়েরা এত বেহায়া কেন হয়—

সিনথিয়া নামের এই বেহায়া মেয়েটি শোভনের মাঝে কি দেখেছিল জানি না দুই মাসের মাঝে তারা বিয়ে করে ফেলল। আমার সাথে যখন দেখা করতে এল তখন শোভনকে চেনা যায় না। চকচকে স্যুট, লাল টাই জ্যাকেটের পকেট থেকে রুমাল বের হয়ে আছে, কলারে ছোট লাল গোলাপ, আমি প্রথমবার লক্ষ করে বুঝতে পারলাম শোভনের চেহারা আসলে খারাপ নয়।

এরপর শোভনের সাথে আমার সেরকম যোগাযোগ নেই। আমেরিকান স্ত্রী থাকার কারণে তার এ দেশে থাকার এবং কাজ করার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত হয়েছে।

ভাল একটা রেস্টুরেন্টে কাজ পেয়েছে। সিনথিয়াকে নিয়ে বেশ সুখেই আছে বলে জানতাম।

বছর দুয়েক পরে শোভন আমার সাথে দেখা করতে এল। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে খুব সমস্যার মাঝে রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার শোভন, কী হয়েছে?

শোভন সোজাসুজি প্রশ্নে উত্তর না দিয়ে বলল, বুঝলেন জাফর ভাই, কখনো আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করবেন না।

কেন কী হয়েছে?

সিনথিয়ার সাথে ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে।

তাই নাকি। আমি সত্যিই খুব বিচলিত হলাম। বললাম, কেমন করে হল?

আমারও একটু দোষ আছে।

কী দোষ?

আমেরিকান মেয়ে তো, কখনো সাদা মন নিয়ে দেখি নাই। সব সময়ে সন্দেহের চোখে দেখেছি।

সত্যি?

হ্যাঁ। বিয়ে করার পর সিনথিয়াকে বললাম, দুই জনের আলাদা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হোক, আমার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখব বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে সংসারের জন্যে খরচ করা হবে—

তাই বললে তুমি?

হ্যাঁ। বোকা মেয়ে তাতেই কি খুশি। তা ছাড়া বাঙালি কায়দা কানুন কিছু খাটিয়েছিলাম। সব মিলিয়ে উল্টা অ্যাকশান হয়েছে। আপনি একটু সিনথিয়ার সাথে কথা বলে দেখবেন?

আমি? আমি তো তাকে চিনিই না।

তবু বলবেন?

কী বলব?

ডিভোর্স যেন না করে। বড় মায়া পড়ে গেছে মেয়েটার উপর।

আমি সিনথিয়ার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে মোটামুটি অপমানিত হয়ে ফিরে এলাম। শোভন ঠিক কি করেছে জানি না, কিন্তু সিনথিয়ার সমস্ত বাঙালি সম্প্রদায়ের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে। তার ধারণা বাঙালী মাত্রই ঠগ এবং জোচ্চোর।

আমেরিকায় ডিভোর্স ব্যাপারটি খুব সহজ নয়। প্রথমে কিছুদিন আলাদা থাকতে

হয় তারপর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ভাগাভাগি করতে হয়—তার নানা রকম কায়দা কানুন রয়েছে। শোভন একদিন এসে তার অ্যাকাউন্টের সমস্ত টাকা তুলে আমার ব্যাংকে জমা দিয়ে গেল, উদ্দেশ্য অত্যন্ত সরল—ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাগাভাগি করার সময় সিনথিয়াকে যেন টাকার ভাগ দিতে না হয়!

ব্যাপারটি সহজভাবেই শেষ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তার মাঝে হঠাৎ করে একটা ফ্যাসাদ বেধে গেল। শোভন এসে খবর দিল সিনথিয়া প্রেগনেন্ট।

আমি একটু হকচকিয়ে বললাম, কিন্তু আমি ভেবেছি তোমাদের এখন সেপারেশন চলছে। দুজন দু জায়গায়।

শোভন মাথা চুলকে বলল, তা ঠিক। কিন্তু কয়দিন আগে দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন কথায় কথায়—

সিনথিয়াকে প্রেগনেন্ট করে ফেলছ?

শোভন বোকার মত হেসে বলল, হ্যাঁ।

দুবছর হল বিয়ে হয়েছে কিছু হয়নি আর এখন এই মুহূর্তে—

কখন কী হয় কিছু বলা যায় না, জাফর ভাই।

বাচ্চাটি এখন কে পাবে?

শোভনের মুখ হঠাৎ শক্ত হয়ে যায়। বলল, সেটা নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি।

কি হয়েছে।

সিনথিয়া বলেছে বাচ্চাটি কাউকে দিয়ে দেবে।

দিয়ে দেবে?

হ্যাঁ, এডপশান এজেন্সীকে দিয়ে দেবে। আমি রাজি না। আমি বলেছি আমার বাচ্চা আমাকে দিতে হবে।

তুমি নিয়ে কী করবে?

আমি মানুষ করব। আমার বাচ্চা আমি মানুষ না করলে কে মানুষ করবে?

কেমন করে মানুষ করবে?

এখনো ঠিক করিনি। আমি যদি না পারি দেশে গিয়ে আমার মায়ের কাছে দিয়ে আসব। আমার মা মানুষ করবে। কী বলেন আপনি?

তুমি যা ভাল মনে কর।

সিনথিয়ার সাথে খুব গোলমাল এটা নিয়ে। শোভন চিন্তিত মুখে বলল, ব্যাপারটা কোর্টে নিতে হবে।

কোর্টে?

হ্যাঁ।

আপনাকে তখন আমার হয়ে সাক্ষী দিতে হবে।

কী সাক্ষী দেব?

আপনি আমাকে কতদিন থেকে চেনেন এই সব। দেবেন তো?

দরকার হলে তো দেবই।

শোভন মুখ শক্ত করে বলল, আমার বাচ্চাকে দিয়ে দেবে ফাজলেমী নাকি? জান থাকতে নয়।

মায়ের গর্ভের শিশুকে নয় মাস প্রস্তুতি নিতে হয়। যখন শোভনের সন্তান তার মায়ের গর্ভে জন্ম নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন শোভন সেই সন্তানের উপর নিজের অধিকার অর্জনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। সিনথিয়াকে নানাভাবে বুঝিয়ে কোন লাভ হল না, সে নিজের সন্তানটি নিজের কাছে রাখবে না, শোভনকেও দেবে না। সন্তানটি সে কোন সন্তানহীন দম্পত্তিকে দিয়ে দেবে। তার ধারণা শোভন সন্তানটির পিতার দায়িত্ব নেবার যোগ্য নয়।

শোভন তার বাচ্চাটিকে পায়নি। শুধু যে পায়নি তাই নয় বাচ্চাটিকে এক নজর দেখতেও পারেনি। বাচ্চাটির জন্মের সাথে সাথে এডপশান এজেন্সীর সাহায্যে এক দম্পত্তিকে দিয়ে দেয়া হয়েছিল। সিনথিয়া শোভনকে শাসিয়ে রেখেছিল যদি সে বাচ্চা নিয়ে বাড়াবাড়ি কিছু করে তাহলে তার এদেশে থাকার কাগজপত্র বাতিল করে দেবে। শোভন শেষ পর্যন্ত বাড়াবাড়ি কিছু করেনি।

বাবা হয়তো আবার হতে পারবে কিন্তু এদেশে থাকার অধিকার হারালে সেটা আর নাও পেতে পারে।